প্রকাশক :
শ্রীঅনুপম রায়
চয়ন
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ— ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীমধুসূদন বাগচী
শ্রীপঞ্চমী প্রেস
১, মানিকতলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ দু'টি কথা ॥

সমস্ত বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাকে একটি খণ্ডে তুলে ধরবার চেষ্টা বাতুলতা। এখানে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকের রচনা সন্নিবিষ্ট করা হল। সে উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, 'মানবতা বোধ'। 'মানবতা বোধে' সোচ্চার হয়েছেন, এমন কয়েকজন বিদেশী লেখকের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'মানবতা বোধ' এমন একটি শব্দ এবং তার অর্থের ব্যাপকতা এত বেশী গভীর যা' সহজে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কম বেশী সব দেশের লেখকেরাই মানবতাবোধের অধিকারী। তবে কিছু লেখক আছেন (দেশে এবং বিদেশে) যাঁরা 'মানবতাবোধের' ওপরই বড় বেশী গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য রচনা করে থাকেন। সন্নিবিষ্ট সাহিত্যিকেরা তাঁদেরই সহধর্মী।

সাহিত্যে নানা ধরণের বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মানবতাবোধকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হল, সে প্রশ্নের জবাবে শুধুমাত্র এই কথাই বলা চলে যে, মানবতাবোধই একজন সাহিত্যিক ও তাঁর রচনাকে চিরায়ত সাহিত্যে উত্তীর্ণ করে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে মানবতাবোধের প্রকাশ কিছু কম নয়। এ দেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ নীতির মূলকথা সহ-অবস্থান ও মানবতাবোধ। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যেও যে মানবতাবোধের প্রমাণ কিছু কম নেই, এই কয়টি রচনা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মানবতাবোধের অভাবে যে মানসিক হাহাকার সৃষ্ট হয়, তার অভাব শুধু আমরাই অনুভব করি না। বিদেশীরাও করে থাকেন।

এ ছাড়াও আর একটি কথা এখানে বলা অপ্রাসংঙ্গিক হবে না যে, আজকে সমস্ত দুনিয়ায় যে পরিমাণ অস্ত্রের লড়াই চলছে এবং অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত হচ্ছে ও পরিশেষে নিজেদের সমর প্রস্তুতির কথা উচ্চরবে, আত্মদম্ভে ও সগর্বে প্রকাশ করছে, সেখানে মানবতাবোধ স্বভাবতই পঙ্গু ও কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। যদিও গরীব রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ মানবতাবোধকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, তবুও ধনী রাষ্ট্রের অস্ত্রের আওয়াজে তা' চাপা পড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির মূল কথা হচ্ছে মানবতাবোধ ও সহ-অবস্থান। এ দেশ ধর্ম, দর্শন ও মানবতাবোধের দেশ। সেই কারণে বিদেশী লেখককুলের কয়েকজন (এ ছাড়া আরো আছেন) যাঁরা আমাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের আত্মিক বন্ধু। তাঁদের স্মরণ করাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে কর্তব্য এখানে সোচ্চারে প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় ক্ষীণ স্বরে পালন করা হল। সোচ্চারে পালন করতে গেলে পুস্তকের আয়তন বাড়ে।

আমার বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে আমার বন্ধু শ্রীরঞ্জন রায়চৌধুরী আমাকে উৎসাহিত করবার ফলেই এ বই রচনা করা সম্ভব হল। তিনি প্রকাশনার দায়িত্ব নেবার অর্থ, মানবতাবোধের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে অংশীদার করা। তাঁর এ উদারতার জন্যে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই শুধু মাত্র আমার কাছে নয়, সকলের কাছেই ধন্যবাদার্হ। এই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে বন্ধুবর সৌরেন গুপ্তের নাম। যিনি প্রকাশনার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে আমাকে দায়মুক্ত করেছেন।

পাঠক সমাজে এই বই সাদরে গৃহীত হলে, আমি এবং আমার প্রকাশক আনন্দিত। কারণ তাহলে আমার পরিশ্রম ও প্রকাশক বন্ধুর অর্থের একটা মোটামুটি মূল্যায়ণ সম্ভব।

বিনীত—

অরুণ কান্তি সাহা

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ডাক
মিথুন মহল
গান কর হে গুণী
বাড়ী ভাড়া
লগ্ন এলো
রাজপ্রাসাদের রহস্য
বাংলার রূপকথা
আমার নাম মীরাবাঈ
অলিভার টুইষ্ট : ডিকেন্স গ্রন্থাবলী (১)

অসিত সাহা

মোঁপাসা

[ছোট গল্পের রাজা মোঁপাসা। এ ক্ষেত্রে তাঁর দান অনস্বীকার্য এবং তাঁকে একক নায়ক ও বলা যেতে পারে। জীবনের বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে চরিত্র-চিত্রণে প্রভূত সাহায্য করেছে এবং একজন সফল চিত্রকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর জন্ম নরম্যাণ্ডিতে। পিতার দিক থেকে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েও তাঁর শেষ পরিণাম দারিদ্র্য বরণ। মা ছিলেন সাধারণ পরিবারের মহিলা। কিন্তু সে যুগে সাহিত্যিক মহলে তাঁর যাতায়াত এবং যোগসূত্র ছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রে একটা উদ্ধত ভাব দেখা যায়। আসলে তিনি কারো সঙ্গেই বড় একটা মানিয়ে চলতে পারতেন না। একটা বন্য মনোভাব তাঁকে বার বার নানা রোমাঞ্চকর অভিযানের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাতো। সেই কারণে গভীর রাত্রে তিনি তাঁর ছোট্ট নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিতেন। নানা বিপদ—সীমার মুখে এসে রোমাঞ্চিত হতেন এবং আনন্দ পেতেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে আমি সারারাত নৌকার দোলায় দোল খাই আর স্নান করি। বেলাভূমির ইঁদুরেরা এবং ব্যাঙেরা আমার নৌকার আলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং আমাকে অভিনন্দন জানায়।

এই সব নাটকীয় এবং চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর স্মরণীয় নানা ছোট গল্পে সর্বত্র ছড়ানো। বিশেষ ভাবে মাঝি, কৃষক, নায়িকা, নাবিক, কেরাণী ইত্যাদি ছোট গল্প স্মর্তব্য। তাঁর নিখুঁত অনুভূতি এবং দূর-দৃষ্টি, মানব-প্রকৃতির মূলে অনায়াসেই ঘা দিতে পারতো। তিনি তাঁর সহজাত প্রতিভা দিয়ে মানব-চরিত্র বুঝতে সক্ষম হতেন এবং আলোকপাত করতে পারতেন। যদিও তিনি কৈশোরে উদ্ধত প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। কিন্তু তা' হলেও লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। শিক্ষকের উপদেশ এবং শিক্ষা বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করতেন। তাঁর একজন শিক্ষক বলেছিলেন যে দেখো! ভাল করে দেখো! এবং আবার ও দেখো। দেখার মধ্য দিয়েই মানুষের যা কিছু অনুভব এবং অনুভূতি এবং তা' থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, সেটা হল অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। তাঁর চরিত্র-চিত্রণে সকল মানব-চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত তো নয়ই বরং বাস্তববাদী। তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিবান লেখকদের মধ্যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-গুলিই বড় বেশী বাস্তবধর্মী এবং সত্যধর্মী। তিনি নিজেই বলেছেন: আমি স্বর্গকে ভালবাসি পাখীর মত। বনানীকে ভালবাসি নেকড়ের মত। উত্তুঙ্গ পাহাড়কে ভালবাসি কৃষ্ণকায় হরিণীর মত। সবুজ ঘন ঘাসের আস্তরণকে ভালবাসি ঘোড়ার মত। একটি ঘোড়া যেমন ঐ ঘন ঘাসে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াতে ভালবাসে আমার মনও ঠিক তেমনি ঐ ঘন ঘাসের ঘ্রাণ ও পরশের জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। আমি

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলকে ভালবাসি মাছের মত। মানুষ যেমন এই পৃথিবীকে ভালবাসে, আমি তেমনই করে এই পৃথিবীকে ভালবাসতে চাই না। ভোগ করতে নারাজ। আমি এই পৃথিবীটাকে আমার বুকের পাঁজরের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই। তাকে আমার উপলব্ধিতে ভোগ করতে চাই। বন্য জন্তুদের যেমন বনানী না হলে চলে না। আমার ও তেমন এই পৃথিবীটাকে প্রয়োজন। এই পৃথিবীকে আমার ভোগ করবার বাসনা অনেকটা বন্য জন্তুদের মত। বন্য জন্তুদের মতই আমি আমার এই পৃথিবীটাকে ভালবাসি।

মোঁপাসার 'যৌতুক' গল্পটি আশা করা যায় ভারতীয়দের ভালই লাগবে। কারণ ভারতীয় পণপ্রথার সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় এবং সখ্যতা আজকের নয়। এই গল্পে মোঁপাসা ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'যৌতুকদান বা পণপ্রথা' মানুষের বিবাহিত জীবনকে কতখানি আচ্ছন্ন করতে পারে। অথবা 'পণপ্রথা' মানুষের বিবাহিত জীবনে কতখানি প্রতিফলিত। এই গল্পে তাঁর গল্প বলবার ক্ষমতা এবং নিজস্বতা প্রকট ভাবে প্রমাণিত। তাঁর ভাষা একদিকে যেমন কাব্যিক। অপর দিকে তেমন তীক্ষ্ণ এবং তেজস্বী।]

মোঁপাসা | যৌতুক

সীমন্ ও জেনীর মধ্যে যে বিবাহের যোগাযোগ এবং আয়োজন চলছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। সীমন্ এখন মোটামুটি ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এই কিছুদিন আগে সে 'নোটারী-অফিসার' হয়েছে। অবশ্য তার জন্যে তাকে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে। এদিকে বিচিত্র এই যে, জেনীর হাতেও তিন শো হাজার ফ্রাঙ্ক্ জমা আছে। সুতরাং যোগাযোগ ভালই।

সীমন্ অত্যন্ত সুপুরুষ এবং বয়সে তরুণ। স্মার্ট। নিজস্ব একটা স্টাইল ও আছে। কথা-বার্তা, ভাবে এবং ভঙ্গিতে সংবেদনশীল। মন আকৃষ্ট করবার সহজাত ক্ষমতাও আছে তার।

এদিকে জেনীও কম যায় না। সেও গৌরবর্ণা এবং সুশ্রী। শরীরের গড়ন আকর্ষণীয়। ব্যবহার ও ভাল। জেনী যে দেখতে সুন্দরী, এটা তার পোষাকের উজ্জ্বলতায় নয়। পরিপূর্ণ নিজস্বতায়।

ঠিক হল প্যারিসে কিছুদিন বেড়িয়ে আসবার পর, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে সংসার পাতবে।

যাবার আগের চার দিন, তারা কেউ কাউকে ছাড়তে সম্মত নয়। অর্থাৎ সর্বক্ষণ তারা কাছে কাছেই রয়ে গেল। জেনী তার ভাবী স্বামীকে প্রায় পূজো করতে শুরু করে দিল। সীমন্‌কে ছাড়া জেনী প্রায় অচল। সারাদিন সীমনের কাছে কাছে থাকে। তাকে আদর করে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আঙুল নিয়ে খেলা করে। তার দাড়ি ধরে টানে। নাকে সুড়সুড়ি দেয় এবং দু'কান ধরে বলে: চোখ বোঁজো আর মুখটা বড় করে হাঁ করো। দেখবে কেমন সুন্দর একটি জিনিষ পেয়েছ। সীমন্ তাই করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি জিনিষ সে পুরস্কার হিসাবে লাভ করে, যা'তে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। এবং খুশীতে মন ভরে ওঠে। সীমন্ ও কম যায় না। তার ও হাত আছে। পা আছে। মুখ আছে। চোখ আছে। সে'ও বসে নেই। তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সে সংব্যবহার করে যাচ্ছে তার ভাবী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে। এই ভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পার হয়ে যাচ্ছে।

এক সপ্তাহ পরে সীমন্ তার ভাবী স্ত্রীকে বললো: তুমি যদি অনুমতি করো, তবে আগামী মঙ্গলবারে আমরা প্যারিসে রওনা হতে পারি। বিয়ের আগে একটা বিয়ের মহড়া দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা সেখানে যুগল-প্রেমিক হয়ে ঘুরে বেড়াবো। রেঁস্তোরায় খাব। নাটক দেখবো। 'কনসার্ট হলে' নাচ দেখবো। আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেব। মানে এক কথায় একটা বোহেমিয়ান্ ভাব।

সীমনের কথা শুনে জেনী আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো: অপূর্ব! অপূর্ব! চলো এখুনি বেড়িয়ে পড়ি।

সীমন্ বললো : হ্যাঁ! সেই ভাল। তবে তোমার বাবাকে আমাদের বিবাহের যৌতুকের টাকাটা রেডী রাখতে বলবে। যাবার সময় ওটা লাগবে। অর্থাৎ আমি ঐ টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। কারণ তুমি তো জানোই যে, আমাদের যাবার পথে আমি যে অফিসারের 'নোটারী' হয়েছি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আর দেরী না করে, ঐ টাকাটা প্রাপ্য হিসাবে তাকে দিয়ে দিতে চাই। ওটা দিতে পারলেই আমার পদটি পাকা হয়। অর্থাৎ পাকা ভাবে আমি বহাল হতে পারি।

: বেশ, আগামীকাল সকালেই আমি আমার বাবাকে জানাবো। টাকাটা তো আমারই। দিতে কোন অসুবিধা হবে না।

জেনীর কথা শুনে সীমন্ খুব খুশী। সে আরো গভীর ভাবে জেনীকে ভালবাসতে শুরু করে দিল। যে ভালবাসা গত চারদিন থেকে বাড়তে বাড়তে আটদিনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নির্দিষ্ট মঙ্গলবারে শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী তাঁদের ভাবী জামাতা এবং মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিতে গেলেন। তিনি জামাতাকে বললেন : আমার মনে হয়, এতগুলো টাকা তোমার সঙ্গে না নেওয়াই ভাল।

জামাতা হেসে বললো : আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার অভ্যাস আছে। আপনি জানবেন, আমার মত অফিসারেরা এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে যায়। সুতরাং আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আর তা' ছাড়া এই সামান্য ব্যাপারে বেশী সময় নষ্ট না করাই ভাল। আপনি আমাদের জন্যে একটুও চিন্তা করবেন না।

গার্ড হাঁক্লো : যাঁরা প্যারিসে যাবেন উঠে পড়ুন।

সীমন্ ও জেনী তাড়াতাড়ি একটি কামরায় উঠে পড়লো। সেখানে আগেই দু'জন মহিলা বসেছিলেন।

সীমন্ তার ভাবী স্ত্রীর কানে কানে বললো : না! জ্বালালে দেখছি। মহিলা বসে আছে, সুতরাং ধূমপান করা যাবে না।

জেনীও নীচু গলায় জবাব দিল : হ্যাঁ! আমিও বিরক্ত হচ্ছি। তবে তোমার ধূমপানের জন্যে নয়।

গার্ড বাঁশী বাজালো এবং ট্রেন চলতে লাগলো। এক ঘণ্টার যাত্রা। কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা বিশেষ কোন কথা বলতে পারলো না। কারণ পাশে বসে থাকা দু'জন মহিলা সারা পথ জেগেই ছিলেন। ঘুমোন নি।

কয়েকটা ষ্টেশান পার হতেই সীমন্ তার স্ত্রীকে বললো: চলো! আমরা এখানে নেমে পড়ি। আশে-পাশের একটা হটেলে বিশ্রাম নিয়ে প্রাতঃরাশটা সেরে নি।

জেনী বললো: হ্যাঁ! হ্যাঁ! খুব ভাল কথা। কিন্তু কাছাকাছি কি কোন ভাল হটেল পাবে?

: না। একটু দূরে যেতে হবে। তবে আমরা বাসে যাব।

জেনী অবাক হয়ে বললো: বাসে কেন? ফিটন্ কী হল?

সীমন্ হেসে বললো: বাসে গেলে খরচ বাঁচবে। এটা বুঝছো না কেন? ফিটনের 'রেট' বেশী এটা কি অস্বীকার করতে পারো?

: না তা' নয়। তবে—। জেনী কথাটা বিড় বিড় করে বললো। সে যেন এখন অনেকটা হতবুদ্ধির মধ্যে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতেই একটা বাস এসে পড়লো। বাস ভরতি লোক। সীমন্ চেঁচিয়ে বললো: ড্রাইভার! ড্রাইভার!

বাস থামলে। তিলার্ধ জায়গা নেই। সীমন্ তার ভাবী স্ত্রীকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললো: আরে! উঠে পড়। আমি উপরে যাচ্ছি। অত্যন্ত ক্লান্ত। এবারে একটা সিগারেট না খেলেই নয়। প্রাতঃরাশের আগে একটা সিগারেট আমাকে খেতেই হবে।

জেনীর তখন জবাব দেবার সময় নেই। বাসের পা-দানীতে পা রাখতেই কন্‌ডাকটার এক রকম জোর করেই জেনীকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। জেনী অবাক। ভেতরের অবস্থাটা যে এত খারাপ তার ধারণা ছিল না। কিন্তু সামনেই বসবার একটা 'সিট' পেয়ে যেতে, তাড়াতাড়ি বসে পড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। দেখলো তার স্বামী দোতলায় উঠে যাচ্ছে। জেনীর সেখানে একটুও নড়বার উপায় নেই। সে যেন স্থবির বসে আছে। পাশে

একজন অতি মোটা মানুষ বেশ মৌজ্ করে চোখ বুজে তামাক খাচ্ছে। আশ-পাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জেনীর ভীষণ খারাপ লাগতে লাগলো। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। অপর পাশে একজন বৃদ্ধা মহিলা কুকুর নিয়ে বসে। তিনি বসে বসে কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন।

বাসের অন্যান্য যাত্রীরা লাইন করে বসে। তাদের মধ্যে রয়েছে মুদী-দোকানের একটি ছেলে। একজন খেটে খাওয়া মহিলা। একজন পদাতিক সৈনিক। একজন সোনালী-চশমা ধারী ভদ্রলোক। মাথায় সিল্কের টুপি। দূর থেকেও চক্চক্ করছে। একপাশে একটু ছেলে দাঁড়িয়ে। মুখে মোটা একটা পাইপ। দু'জন মহিলা। মুখে বিরক্তির ভাব। তাঁরা যেন বাসের সহযাত্রীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন। মুখের ভাবটা এমন যে তাঁরা যেন বলতে চাইছেন, আমরা যদিও একই বাসে যাচ্ছি, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী হিসাবে, আমরা এক শ্রেণীতে পড়ি না। দুটি বোনও যাচ্ছে। একজনের চুল লম্বা। অপর জন বয়সে বোধ হয় কিছুটা বড়। বাসের সকলের চেহারা, মুখের অবস্থা এবং দৃষ্টি ও বসবার ভঙ্গি, সব মিলিয়ে একত্র করলে যে ছবি ফুটে ওঠে সেটা হাস্যস্পদ। অনেকটা কৌতুকপ্রদও বটে। যেন প্রতিটি যাত্রী তাঁরা নিজেদের ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কিছু না কিছু রস সৃষ্টি করছেন। অথবা বলা যায় একট মিউজিয়ামে এই সব মূর্ত্তিগুলোকে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন একটানা একটা কার্টুন ছবি। যেখানে মানুষের মুখগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে আঁকা আছে। কিম্বা আরো সুন্দর করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, একটা ষ্টেজের ওপরে পাপেট্ ড্যান্স হচ্ছে। অর্থাৎ একদল পুতুল সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে এবং বিভিন্ন মুখভঙ্গি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেপথ্যে একজন সুতো নেড়ে ওদের পরিচালনা করছে। চিন্তা করলে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ায়।

বাসটা জোরে চলবার ফলে প্রত্যেকের শরীরে ঝাঁকুনী লাগছিল। একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। একজনের মুখ অপরের মুখের সঙ্গে লেগে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে কিছু কথা-বার্তাও

চলছিল। ফলে মিলিত ঐক্যতান একটা গোলমাল সৃষ্টি করছিল। কিছু বেকুব লোক আবার এর মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ছিল।

জেনী বসে বসে এইসব দেখছিল আর ভাবছিল যে সীমন্ তার সঙ্গে ভেতরে এল না কেন? একটা গোপন দুঃখ তার মনকে পীড়িত করতে লাগলো। সামান্য একটা সিগারেট একটু আরাম করে খাবার লোভ সে সামলাতে পারলো না। একটা সিগারেটের নেশার কষ্ট সে সহ্য করতে নারাজ। মনটা তার খারাপ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দু'টি বোন বাস ড্রাইভারকে গাড়ী থামাবার সংকেত করলো। বাস থামলো। তারা নেমে গেল। বাস আবার চলতে লাগলো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামলো। একজন রাঁধুনী উঠলো। হাতে বাজারের বাকেট্। সে তার কোলে বাকেট্-টি নিয়ে সোজা হয়ে বসলো। কিছু পথ আসতেই একদল হষ্টেলের ছেলে হৈ হৈ করে উঠে বাসটাকে ভরতি করে ফেললো।

জেনী মনে মনে ভাবলো: এতটা পথ! আশ্চর্য! পথে আরো কিছু লোক নামলো-উঠলো। বাস টানা চলতে লাগলো। জেনী অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। তার এখন কান্না পেতে লাগলো। কিন্তু কেন কান্না পাচ্ছে সে নিজেই জানে না।

আর কতদূর! জেনী নিজের মনেই বললো: আমার মনে হয় লোকটা বোধহয় ভুলে গেছে। কিম্বা ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

যাত্রীরা নামতে শুরু করলো। একে একে সকলেই নিজেদের নির্দিষ্ট পথে নেমে গেল। বাস ফাঁকা। জেনী একা বসে।

ড্রাইভার বললো: বাস আর যাবে না।

জেনী ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। তা' দেখে ড্রাইভার কাছে এসে বললো: বাস আর যাবে না।

জেনীর চমক্ ভাংলো। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো যে বাসে আর কেউ নেই। সুতরাং ড্রাইভার তাকেই বলছে। সে ড্রাইভারের দিকে

তাকালো। ড্রাইভার এবারে বিরক্ত হয়ে বললো: বাস তার জায়গায় এসে গেছে। আর যাবে না।

জেনী বললো: আমরা এখন কোথায়?

ড্রাইভার এবারে রেগে গিয়ে বললো: আমি অনেকবার আপনাকে বলেছি যে বাস আর যাবে না। এখানেই শেষ।

জেনী বললো: 'বুলেভার্ড' কী আমরা ছাড়িয়ে এসেছি?

: 'বুলেভার্ড'! ড্রাইভার বিস্ময় প্রকাশ করলো।

জেনী বললো: 'বুলেভার্ড দ্য ইটালিয়ান।'

: অনেক আগে ছাড়িয়ে এসেছি।

: আপনি যদি আমার স্বামীকে একটু দয়া করে জানান।

: আপনার স্বামী! কোথায় সে?

: ওপরে।

: ওপরে তো অনেকক্ষণ কেউ নেই।

জেনী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো: কী বলছেন আপনি? হতেই পারে না। সে আমার সঙ্গে একই বাসে এসেছে। আপনি দয়া করে ভাল করে দেখুন। সে নিশ্চয়ই আছে।

ড্রাইভার এবারে কড়া গলায় বললো: দেখুন বললে কী হবে। ওপরে কেউ নেই। আমাদের 'ট্রিপ' শেষ। আপনি দয়া করে নেমে আসুন। রাস্তায় একজন কেন দশ জনকে আপনি পাবেন।

জেনীর চোখে জল এলো। বুক ভরে তার কান্না উঠতে লাগলো। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো: আপনি ভুল করছেন। আপনি বিশ্বাস করুণ যে আপনি ভুল করছেন। তার হাতে একটা বড় ব্যাগ আছে।

ড্রাইভার তখন হাসতে হাসতে বললো: ও! সেই বড় ব্যাগ-ওলা লোকটা। সে অনেক আগে নেমে গেছে।

: অনেক আগে!

: হ্যাঁ! 'লা ম্যাডেলিনিতে'। তা'হলে আপনাকে ফেলে পালিয়েছে। হা! হা! হা!

বাস দাঁড়িয়ে। জেনী নীচে নামলো। ওপরে একবার তাকালো। ওপরটা শূন্য পড়ে আছে। একটি লোকও নেই।

জেনী বোধ হয় জোরেই কেঁদে উঠতো। কিন্তু লজ্জায় পারলো না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো : এখন আমার কি হবে ? আমি কি করবো।

বাসটি ষ্টেশানের গায়েই থেমেছিল। ষ্টেশানমাষ্টার এগিয়ে এসে বললেন : কী ব্যাপার ?

বাস ড্রাইভার হেসে হেসে বললো : মহিলাকে ফেলে ভদ্রলোক পালিয়েছে।

ষ্টেশানমাষ্টার বললেন : তোমার তা'তে কী ? তুমি তোমার কাজে যাও।

জেনী আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ষ্টেশান ছেড়ে নীচে নেমে এল। সে হতবাক্। একটা হতবুদ্ধি আর বিস্ময় তাকে ঘিরে ধরলো।

সে ভাবলো : এখন সে কোথায় যাবে। কী করবে। সীমনের কী হতে পারে। সে কী করে এতটা ভুল করলো। সীমন্ কী করে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে ? আর তা' ছাড়া সে এতটা অন্যমনস্কই বা হবে কেন ?

জেনীর কাছে মাত্র দু'ফ্রাঙ্ক্ রয়েছে। এদিয়ে কি হতে পারে ? ভাবতে ভাবতে জেনীর হঠাৎ মনে পড়লো, এখানে তার এক মামাতো ভাই নৌবিভাগে চাকরি করে। ভাল 'পোষ্টে' আছে। সে খুঁজে তার ঠিকানা বার করলো। তারপর একটা ফিটন ভাড়া করে তার বাড়ীর দিকে চললো। মামাতো ভাই তখন অফিস যাচ্ছিলো। রাস্তায় জেনীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সীমনের মত তার হাতেও একটি বড় ব্যাগ। জেনীর সীমনকে মনে পড়লো।

ভাইকে দেখে জেনী ফিটন্ থেকে লাফিয়ে হাত ইশারায় তাকে ডাকলো।

মামাতো ভাই অবাক। সে বললো : জেনী ! কী ব্যাপার ! তুমি ! একা ! কোথ্থেকে আসছো ?

জেনী প্রথমটা বিড় বিড় করতে লাগলো। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো : কিছুক্ষণ আগে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি।

: হারিয়েছ ! কোথায় !

: বাসে।

: বাসে ! ওহো !

জেনী তখন কাঁদতে কাঁদতে বাসের সব ঘটনা তাকে জানালো। লোকটি খুব মন দিয়ে শুনে বললো : আজ সকালে কি তার মাথা ঠিক ছিল ?

: হ্যাঁ ! ছিল।

: তার সঙ্গে কি অনেক টাকা-পয়সা ছিল ?

: ছিল ! আমার বিয়ের যৌতুকের টাকাটা ছিল।

: যৌতুকের টাকা। সম্পূর্ণ টাকাটা ?

: হ্যাঁ ! সম্পূর্ণ টাকাটা। তার 'প্র্যাকটিসের' জন্যে তাকে দেওয়া হয়েছিল।

: ওহো ! তা'হলে এতক্ষণে সে জমিয়ে 'প্র্যাকটিস্' শুরু করে দিয়েছে।

জেনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না। সে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো : আমার স্বামী—মানে আমার স্বামী—

: হ্যাঁ ! আমি বলতে চাইছি যে, তোমার স্বামী তোমাকে পরিষ্কার ভাবে প্রতারণা করেছে। অর্থাৎ সোজা ভাষায় তুমি সম্পূর্ণ প্রতারিত। সে তোমার টাকায়, তার ব্যবসা গুছিয়ে নিয়েছে। এই শেষ কথা।

ভাইয়ের কথা শুনে জেনীর যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। সে আপন মনেই বলতে লাগলো : তা'হলে—তা'হলে কী আমি বুঝবো যে সে একটা 'স্কাউনড্রেল্'। জেনী কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।

রাস্তার লোকেরা তাদের দিকে তাকিয়ে। জেনীর ভাই সেখানে আর অপেক্ষা না করে তাকে বাড়ী নিয়ে এল। তারপর বাড়ীর পরিচারিকাকে ডেকে বললো : সোফিয়া ! হটেলে গিয়ে দু'জনের খাবার বলে এস। আজ আর অফিসে যাব না।

মার্কটোয়েন

[মার্ক টোয়েনের আসল নাম স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স্। কিন্তু তিনি "মার্ক টোয়েন" এই ছদ্মনামে বিশ্ব সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর শৈশব কেটেছে 'হানিবল' শহরে। 'হানিবল্' শহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। সেই সৌন্দর্যের পটভূমিতেই তাঁর রচনা "অ্যাডভেঞ্চার অব টম্ সইয়ার" এবং "অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব হাক্‌লবেরি ফিন্।"

মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান এবং তিনি তাঁর দাদার খবরের কাগজের প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে কাজ শুরু করেন। তাঁর ভবিষ্যত সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় এখানেই। টানা ১০ বৎসর তিনি এখানে কাজ করেন এবং শেষে নিজের ভাগ্য ফেরাবার জন্যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'নিউ অর্লিন্স' যাত্রা করেন। কিন্তু মাঝপথে তিনি তাঁর যাত্রা পরিবর্তন করে, মিসিসিপি নদীর স্টীমারের পাইলটের কাজ গ্রহণ করেন।

নদীপথে ষ্টিমার চলার সময় জল মাপতে মাপতে যেতে হয় এবং যেখানে জল বারো ফুটে এসে দাঁড়ায়, জাহাজ তখনি ঘুরে গভীর জলের সন্ধানে চলে যায়। জল যেখানে বারো ফুটে আসে, তখনি জাহাজে হাঁকা হয় "মার্ক টোয়েন"। অর্থাৎ দুই মার্কা। জাহাজে বসে থেকে থেকে এবং ক্রমাগত "মার্ক টোয়েন" কথাটা শুনে শুনে 'ক্লিমেন্সের' এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি ভবিষ্যত-জীবনে "মার্ক টোয়েন এই ছদ্মনামে লেখনী চালনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প "সেলিব্রেটেড্ ফ্রগ অব ক্যালাভেরাজ" ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাঁকে খ্যাতিবান করে তোলে। তারপর তিনি লেখেন "ইনোসেন্টস্ অ্যাব্রড্।"

এরপর তিনি "গিলডেড্ এজ", "অ্যাডভেঞ্চার অব টম্ সইয়ার", "লাইফ অন্ দ্য মিসিসিপি", "ট্রাম্প অ্যাব্রড্", "প্রিন্স এণ্ড পপার", "কনেক্টিকাট্ ইয়াংকি" ও "পাডেন হেড্ উইলসন" ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সব পুস্তক তাঁকে খ্যাতিবান ও অর্থবান করে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যে আজো তিনি অমর হয়ে আছেন]

রাত ন'টা। টম্ এবং তার ভাই সিড্ যথারীতি তাদের প্রার্থনা শেষ করে শুতে গেল। সিড্ শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু টমের চোখে ঘুম নেই। সে যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। সময় চলে যাচ্ছে। অন্ধকার ভেদ করে সেই গভীর রাতে কিছু কিছু শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস যেন আরো জোরে বইছে। রাত গভীর হতে থাকায় টম আরো অস্থির হয়ে উঠছে। সিড্ কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দূরে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। সেই ডাক রাতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে টমের কানে এলো। টম্ একটু একটু করে যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলো। সেই ডাকে আবার সোজা হয়ে বসলো। সে একটি বেড়ালের ডাকও শুনতে পেল। বেড়ালের ডাকটা টমের কানে আসতে টম্, তার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার জানালার বাইরে তাকালো। আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। সে তার মন স্থির করে নিল। তারপর পোষাক পালটে জানালা টপ্‌কে নীচের বাগানে নেমে এলো। বেড়ালটা তখনো ডাকছে। টম সেই ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে গেল। দেখলো ছায়া ছায়া অন্ধকারে তার বন্ধু হাকল্‌বেরি ফিন্ দাঁড়িয়ে। বেড়ালের ডাকটা এতক্ষণ সেই ডাকছিল। তার উপস্থিতি টমকে জানাবার জন্যে। ফিন্ তার কথা রেখেছে। ওদের আগেই ঠিক ছিল যে আজ রাতে ওরা গ্রামের কবরভূমিতে ভূত দেখতে যাবে। ফিন্‌কে পেতে টম্ আর দাঁড়ালো না। সে ফিন্‌কে সঙ্গে নিয়ে সেই গাঢ় অন্ধকারে কবরখানার দিকে ছুটলো।

পথ নির্জন। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। দেবদারু আর পাইনের ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র দু'একটা কুকুরের আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তারা সেই আঁধারে পথ করে করে কবরখানার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। চলতে চলতে টম্ কয়েকবার থমকে দাঁড়ালো। ফিন তাকে সামলে নিল। আধঘণ্টা একটানা হেঁটে তবে তারা কবরখানায় এসে হাজির হল।

এই কবরখানাটা একটা পাহাড়ের ওপরে। গ্রাম থেকে পাকা দেড় মাইল দূরে। আশে-পাশে কোন লোকের বসতি নেই। জনমানব শূন্য, পরিত্যক্ত এই কবরখানায় এতটুকু আলো পর্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এখানে অন্ধকার এত ঘন যে কাছের মানুষ ও চিন্‌তে পারা অসম্ভব। কবরের চারপাশ ঘিরে পাইনের বন। শন্ শন্ হাওয়া বইছে। শুনলে মনে হয় অনেকগুলো মানুষ যেন একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। শুনলেই ভয় করে। টমের মনে হল কবরভূমির মৃত আত্মারা এই গভীর রাতে একটানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে। কথাটা ভাবতেই টমের শরীরটা কেমন যেন ছম্ ছম্ করে উঠলো।

কবরখানার চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওরা দু'জনে সেই বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং পরে সেটা টপ্‌কে ভেতরে এলো। এখানে অনেকগুলো কবরের সীমানা চোখে পড়লো। এই কবরভূমির নীচেই কত মৃত মানুষের হাড় জমা হয়ে আছে। তারা কবরভূমির মধ্য দিয়ে পথ করে করে চলতে লাগলো। এবং শেষে তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। এখানে নতুন কয়েকটি কবরের সীমানা দেখা গেল। টম্ এবং ফিন্ একেবারে নতুন একটি কবরভূমির কাছে এসে দাঁড়ালো। পাশেই একটি পাইনের বড় গাছ। ওদের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। এত নিঝুম আর নিস্তব্ধ এলাকায় ওরা আগে জীবনে আসেনি। ওরা কেউ আর কোন কথা না বলে সেই গাছটার নীচে বসে পড়লো।

ওরা আশ-পাশ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। কোথাও কোন আলো বা শব্দ নেই। শুধু একটানা জমাট অন্ধকার এর সমস্ত সীমানা জুড়ে আছে। অনেকক্ষণ তারা কোন কথা না বলে ঐ গাছটার নীচে চুপচাপ বসে রইলো। তাদের দৃষ্টি সামনের ঐ কবরভূমির দিকে। যেন এখানেই কিছু একটা ঘটবে।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার বাড়ছে। ওদের নিঃশ্বাস ও যেন আরো ভারী হয়ে আসছে।

টমের মনে হল এ ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে সে হয়তো একসময় পাগল হয়ে যেতে পারে। কিম্বা তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তা

যখনি তার মাথায় ঢুকলো, তখনি সে ফিন্‌কে বললো : আচ্ছা ফিন্, তোর কি মনে হয় যে মৃত মানুষেরা আমাদের এখানে এ ভাবে বসে থাকতে দেখলে খুশি হবে।

ফিন্ বললো : আমার জানা নেই।

টম সে কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো : ফিন্, তুই কি মনে করিস যে হস্ উইলিয়ামস্ আমাদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

ফিন্ বললো : আমার মনে হয় তার আত্মা শুনতে পাচ্ছে।

টম বললো : তা'হলে তাকে মিষ্টার উইলিয়ামস্ বলে সম্বোধন করলেই ভাল হত। তবে সবাই কিন্তু তাকে 'হস্' বলেই ডাকতো আমি জানি।

: তা হলেও মৃত মানুষের প্রতি একটু সম্মান দিয়েই কথা বলা উচিত।

টম্ মাথা নীচু করে রইলো। ওরা দু'জন অনেকক্ষণ ঐ এক ভাবে বসে কাটালো। তারপর টম্ হঠাৎ ফিন্‌কে চেপে ধরে বললো : শ্! কিছু শুন্‌তে পেলি ?

ফিন্ বললো : কি বলতো ?

টম্ বললো : ঐ যে শব্দটা। তুই শুনতে পাচ্ছিস্ না ? আমার কিন্তু ভয়ে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিট্‌ছে।

ফিন্ বললো : হ্যাঁ ! এবারে আমি শুনতে পাচ্ছি। ফিন্ ও ভয়ে টম্‌কে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীর কাঁপছে। সে কাঁপতে কাঁপতে বললো : টম্ ওরা আসছে। এবারে ভূতেরা নিশ্চয়ই আসছে। এখন আমরা কি করবো। কী আমরা করতে পারি।

টম্ বললো : আমি জানি না। আমার মাথায় আসছে না। কিন্তু ফিন্, ওরা কি আমাদের দেখতে পাবে ?

: হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! পাবে। লোকে বলে ভূতেরা রাতে বেড়ালের মত দেখতে পায়। না এলেই ভাল হত। এখানে ভূত দেখতে আসা আমাদের উচিত হয় নি।

: আমার মনে হয় না যে ওরা আমাদের কথা চিন্তা করবে। আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি। আমার মনে হয়, আমরা যদি চুপচাপ থাকি তা'হলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

ঃ আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু টম্ আমার কাঁপুনি বাড়ছে।

ঃ চুপ। শোন।

ওরা দু'জনে মাথা নীচু করে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুপটি করে বসে রইলো।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে সমস্ত কবরখানা ভরে গেল।

টম্ সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে নীচু গলায় বললো ঃ দ্যাখতো, ওটা কি ?

ফিন্ বললো ঃ আলো। আমার মনে হয় ওটা মৃত আত্মাদের আলো। ওরে টম্। নিশ্চয়ই তাই।

হ্যারিকেনের মৃদু মৃদু আলোতে তিনটি ছায়া মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ফিন্ কাঁপতে কাঁপতে চাপা গলায় বললো ঃ তিনজন শয়তান ভূত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হে ভগবান। টম্ তুই প্রার্থনা করতে জানিস ?

ঃ আমি চেষ্টা করে দেখছি। আমার মনে হয় ওরা চট্ করে আমাদের কিছু বলবে না।

টম্ প্রার্থনা করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বললো ঃ এই ফিন্, ওটা কিরে ?

ঃ মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ! সামনের লোকটিকে আমি চিনি।

ঃ কে রে ? টম্ ঝুঁকে পড়লো।

ঃ বুড়ো মাফ্ পটার। ঐ দ্যাখ, ও কথা বলছে। ব্যাটা মাতাল হয়ে আছে। আমাদের দেখতে পাবে না। আমি এখন অপর লোকটিকেও চিনতে পারছি। ও হচ্ছে জো।

ঃ আমি জানি জো'র চেয়ে শয়তানেরাও ভাল। কিন্তু ওরা এখাসে কেন ?

দু'জনে অবাক চোখে ওদের দেখতে লাগলো।

আগন্তুকেরা ধীরে ধীরে নতুন কররের সীমানার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ওদের মধ্যে থেকে তৃতীয় কণ্ঠস্বর বললো: এই যে এখানে।' সে তার হাতের হ্যারিকেনটা ওপরে তুলে ধরলো এবং তাতে ডাঃ রবিনসনের মুখটা পরিষ্কার দেখা গেল।

ডাঃ রবিনসন্ বললো: তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এখুনি চাঁদ উঠে পড়বে।

কবর খোঁড়া হতে লাগলো। কোদালের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। ডাঃ রবিনসন্ হ্যারিকেন হাতে একটা গাছের নীচে এসে বসলো। সে এত কাছে এসে বসলো যে, আর একটু হলেই টম্ এবং ফিনকে ছুঁয়ে ফেলতো।

কবর খুঁড়তে খুঁড়তে ঠক্ করে একটা শব্দ হল। খননকারীরা তখন থামলো। তারপর হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে কবরের নীচ থেকে একটা বড় বাক্স ওপরে তুলে নিয়ে এলো। ডাঃ রবিনসন্ বসে বসে দেখতে লাগলো। ওরা তখন সে বাক্সের ডালা খুলে একটা মৃতদেহ বাইরে এনে কাপড় জড়িয়ে মাটিতে রাখলো।

তখন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ স্পষ্ট ভাবে আকাশে উঠে এসেছে। সেইজন্যে সে চাঁদের আলোতে, সেই মৃতব্যক্তির মুখখানা ভাল করে দেখা যেতে লাগলো।

পটার তার কাজ শেষ করে হাতের ছোরাটা নাচিয়ে নাচিয়ে ডাঃ রবিনসনকে বললো: আরো পাঁচ টাকা লাগবে ডাক্তার। না হলে ঐ মরা এখানেই পড়ে থাকবে।

ডাঃ রবিনসন্ চোখ তুলে বললো: তোমার প্রাপ্য তুমি আগেই নিয়েছ। আমি তোমাকে পাঁচ টাকা আগেই দিয়েছি।

জো সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিল। সে এবারে এগিয়ে এসে বললো: তোমার মনে আছে ডাক্তার আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, তোমার বাবার খাবার ঘরে আমি তোমাকে খেতে ডেকেছিলাম। তুমি তা'তে আপত্তি জানিয়েছিলে। এবং বিচিত্র এই যে, সেই সামান্য কারণে তোমার বাবা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। অনেক মিথ্যা অপবাদ আর

অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়েছিলেন। তুমি কি ভাবো যে, সে সব আমি ভুলে গেছি? নাও! এখন টাকাটা ছাড়ো।

ডাক্তার জো'র কথা শুনে হঠাৎ তাকে আঘাত করে বসলো।

পটার তার হাতের ছোরাটা ফেলে দিয়ে ডাক্তারকে বললো: তুমি আমার বন্ধুকে কেন মারলে?

সে ডাক্তার কে আর সময় না দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পটার এবং ডাক্তারের মধ্যে তখন ভীষণ মারামারি চলতে লাগলো।

জো ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পটারের ছোরাটা মাটি থেকে তুলে নিজের হাতে নিল। এবং গুটি গুটি ওদের দিকে এগুতে লাগলো। পটার এবং ডাক্তার এমন ভাবে দু'জনে জড়িয়ে আছে যে এখন মারা সম্ভব নয় জেনে, সে অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ ডাক্তার পটার কে ছেড়ে দিয়ে হাতের সামনে একটা চেলা কাঠ পেয়ে যেতে, সেটা তুলে সে পটার কে মেরে বসলো। পটার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এতক্ষণে জো তার সুযোগ নিল। সে ছুটে গিয়ে হাতের ছোরাটা ডাক্তারের বুকে আমূল বিদ্ধ করে দিল। ডাক্তার পটারের পাশে পড়ে গেল। রক্তে তার শরীর ভিজে গেল এবং পটার কেও ভিজিয়ে দিতে লাগলো। জো তখন ডাক্তার এবং পটারের দিকে তাকালো। ডাক্তার একটা অস্ফুট আওয়াজ করে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

জো বললো: যাক! বাঁচা গেল। তারপর সে তার হাতের ছোরাটা পটারের হাতে গুঁজে দিয়ে, পটারের জ্ঞান হবার অপেক্ষায় বসে রইলো।

মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো। টম এবং ফিন্ ঐ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভয়ে তীব্র বেগে ছুটতে লাগলো এবং পেছনে তাকাতে লাগলো।

একটু পরেই পটারের জ্ঞান ফিরে এলো। সে তার নিজের হাতে ছোরা দেখেই, সেটা ফেলে দিল এবং ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললো: জো, কি ব্যাপার বলো তো? আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

জো বললো : তুমি ডাক্তারকে ছোরা মেরেছ। এবং তাতেই সে মারা গেছে।

পটার অবাক হয়ে বললো : আমি মেরেছি? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি তো ডাক্তার কে মেরে ফেলতে চাইনি। শুধু মাত্র আঘাত করতে চেয়েছিলাম।

জো বললো : ডাক্তার তোমাকে আঘাত করতেই তুমি ছুটে গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে। ভাল করে মনে করে দেখ। তবে তুমি ভয় পেও না। তুমি জীবনে আমার অনেক উপকার করেছ। আমি তা' ভুলিনি। এবং তুমি জানবে যে আমি তোমার এ অপরাধ সারা জীবন গোপন রাখবো। কাউকে জানাবো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

পটার জো'র হাত ধরে বললো : আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার এ উপকার ভুলবো না। পটার কথা বলতে বলতে কাঁদতে লাগলো।

জো বললো : এখন কাঁদবার সময় নয়। তুমি এ পথে চলে যাও। আমি অন্য পথ ধরে যাচ্ছি।

পটার ভয়ে ছুটতে শুরু করলো। জো সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছোরাটা সামনে পড়ে। জো সেটার দিকে একবার তাকালো।

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটলো। এখন ডাক্তারের মৃতদেহ, কবরের মৃতদেহ এবং ঐ বাক্সটা পাশাপাশি পড়ে। চাঁদের আলো ওদের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এবং ধীরে ধীরে কবরভূমিতে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

টম্ এবং ফিন্ ছুটছে তো ছুটছে। তারা বার বার পেছনে তাকিয়ে দেখতো লাগলো কেউ তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে কিনা। অনেকক্ষণ ছুটে আসার পর তারা গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি পোড়ো বাড়ীতে এসে হাঁপাতে লাগলো। তারা দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়লো এবং বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। শেষে টম বললো : ফিন এরপর কি ঘটতে পারে বলে তোর মনে হয়।

ফিন্ বললো: ডাঃ রবিনসন বোধ হয় মারা গেছে। যদি মারা গিয়ে থাকে তবে যে কোন একজনের ফাঁসী হবে।

টম বললো: আমারও তাই মনে হয়।

ফিন্ বললো: কেউ যদি মনে করে থাকে যে পটার এ কাজ করছে, তা'হলে সে ভুল করবে।

টম সে কথার কোন জবাব দিল না। সে চিন্তা করতে লাগলো। পরে চুপি চুপি বললো: আচ্ছা ফিন্, পটার তো এ ব্যাপারটা কিছুই জানে না। তা'হলে সে কি করে বলবে? কারণ জো যখন পটারের হাতে ছোরাটা গুঁজে দিল তখন পটার অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

: তুই ঠিক কথাই বলেছিস্।

ওরা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে টম বললো: ফিন্! তুই এ ব্যাপারটা গোপন করে যেতে পারবি?

: আমাদের পারতেই হবে টম। কারণ এ ব্যাপারটা আমরা দু'জনেই জানি। আমরা যদি এ কথা প্রকাশ করে দি'। আর জো'র যদি ফাঁসী না হয়, তা'হলে সে আমাদের শেষ করে দেবে।

: আমিও সেই কথাই ভাবছি। কারণ পটার সত্যি ঘটনা জানে না। ডাক্তার তাকে একখানা চেলা কাঠ দিয়ে মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। টম চিন্তা করতে লাগলো। পরে বললো: ফিন্, তুই শপথ করে বল যে কাউকে বলবি না।

: না। বললে জো আমাদের খুন করবে। ও লোকটা শয়তানের চেয়েও ভয়ানক। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। আয়, আজ আমরা শপথ করি যে এ ব্যাপারে আমরা কেউ কোনদিন ও মুখ খুলবো না।

টম ঘাড় নেড়ে বললো: এখন অনেক রাত। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। প্রতিজ্ঞা করবার এটাই উপযুক্ত সময়।

ওরা তখন একটা কাঠ খুঁজে বার করলো। এবং পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে তা'তে লিখলো: ফিন্ এবং টম আজ থেকে পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলো যে তারা এ ব্যাপারটা কাউকে

জানাবে না। তারপর আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে নিজেদের নাম সই করলো। তারা তাদের সই শেষ করে একটা বড় গর্তে সে কাঠখানা নামিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিল। এবারে তারা নিশ্চিন্ত হল।

এরপর তারা নিজেদের বাড়ীর পথ ধরলো। টম্ তার শোবার ঘরের জানালা টপ্‌কে চুপি চুপি ঘরে এলো। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি পোষাক পালটে শুয়ে পড়লো এবং মনে মনে এই ভেবে খুশি হল যে, এ ব্যাপারটা কেউ জানতে পারলো না।

কিন্তু টমের ভাই সিড্, যে টমের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল, সে তখন জেগে। টম বিছানায় উঠে আসতে সে আড়চোখে টমের দিকে তাকালো।

হ্যানস্ এ্যানৃডারসন

[হ্যানস্ এ্যানৃডারসন একজন ড্যানিস্ লেখক। তিনি মুচির ছেলে। জীবনে অনেক কষ্টের দিন তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর কর্মের উত্তম হারান নি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি লিখতে সুরু করেন এবং লেখার জন্যে নিজের মনকে তৈরী করতে থাকেন। মাত্র স'তের বছর বয়সে তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "The Improvisatore" প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং তখন তিনি নিজেকে লেখাতেই নিয়োজিত রাখবেন বলে ঠিক করেন। তারপর তিনি সারা জীবন ধরে অজস্র রূপকথার গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন। সে সব গল্প এবং উপন্যাস শুধু সেই সময়ের জন্যেই নয়, আজও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এবং শিশুদের আনন্দ জুগিয়ে চলেছে। তাঁর লেখা বই যেমন সমস্ত দেশে বহু পঠিত, তেমন তাঁর নামও সমস্ত দেশে বহু প্রচারিত। তাঁর লেখা রূপকথার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে "The ugly Duckling" "The Tin Soldier", "The Tinder Box" এবং The Little mermaid" বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এই সব গল্প-উপন্যাসই তাঁকে যশ ও খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে এসেছে। এবং এই খ্যাতির জন্যেই তিনি সেই সময়ে ড্যানিস রাজ-পরিবারের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ৭০তম জন্মদিনে সমস্ত দেশে জাতীয় উৎসব পালন করা হয়।

এই গল্পে এ্যানৃডারসন একটি মৎসকন্যার চরিত্রের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে রাজপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতো। কিন্তু তা' সত্বেও সেই রাজপুত্র যখন তাকে পরিত্যাগ করে অন্য একটি রাজকুমারীকে বিবাহে উৎযোগী হল, তখন সে কোন প্রকার রাগ, ঈর্ষা বা বিদ্বেষ মনে পোষণ করেনি। তিনি বক্তব্য রেখেছেন যে সত্যিকারের ভালবাসা স্বার্থহীন। সে ভালবাসা কোন সময়ই প্রিয়জনের অমঙ্গল চিন্তা করে না। বরং সুখ এবং উন্নতির কথাই চিন্তা করে। এ কাজে ব্রতী হতে গেলে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ জলাঞ্জলি দিতে হয়। সব রকম কষ্টও হাসিমুখে স্বীকার করে নিতে হয়। সত্যিকারের ভালবাসা প্রিয়জনের ক্ষতি করে না। বরং মঙ্গলের পথই প্রশস্ত করে। নিষ্কাম প্রেম সূর্যদয়ের মতই সত্য এবং পবিত্র।]

দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ছোঁয়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে না এমন মানুষ বিরল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একরাশ ফুলে ভরা নীল চাদর বিছানো প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। সমুদ্র বলে মনেই হয় না। মনে হয় মাটি উজার করা ফুলে ভরা প্রান্তরে গা' ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। অথচ এই সব গভীর সমুদ্রের জল হাতে নিলে দেখা যাবে একটুও নীল নয়। একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। গভীরতার সীমা নেই। এত গভীর যে মানুষের ধারণার বাইরে। আমরা যদি কেউ মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থেকে দড়ির পর দড়ি নামিয়ে সমুদ্রের তলদেশ মাপতে যায় ত'াহলে নিশ্চিত ব্যর্থ হব। এমন কি পর পর কয়েকটি গীর্জার মিনারের ওপর গীর্জা বসিয়ে যদি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলেও এর তলদেশ পাওয়া অসম্ভব। সমুদ্রের এত গভীর তলদেশে মৎসকন্যাদের বাস।

চোখ বুজে কল্পনা করলে স্বভাবতঃই মনে হবে সমুদ্রের সেই গভীর তলদেশ বিস্তীর্ণ শাদা বালুকায় ভরা। সেখানে আর কিছু নেই। কিন্তু তা' সত্যি নয়। সমুদ্রের সেই গভীর তলদেশেও মাটি আছে। এবং সে মাটিতে আশ্চর্য রকমের সব গাছ জন্মায়। সে গাছে ফুলও ফোটে। সে সব গাছের পাতা এবং শাখাগুলো এত নরম যে জলের সামান্য আঘাতেই নড়ে ওঠে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোন জীবন্ত প্রাণী যেন জলের নীচে পাশ দিয়ে চলে গেল। সমুদ্রের সেই অতল তলে ছোট বড় মাছেরা গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে খেলা করে যে, পৃথিবীতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাখীদের খেলার কথা মনে পড়ে যায়। সমুদ্রের তলদেশে যেখানে গভীরতা সব চেয়ে বেশী, সেখানে সমুদ্রের রাজার বিশাল প্রাসাদ। এমন প্রাসাদ এই পৃথিবীতে নেই। মানুষ এমন প্রাসাদ জীবনেও কল্পনা করতে পারে না। সমুদ্র-রাজার এই প্রাসাদের দেওয়াল্ গুলো প্রবাল দিয়ে তৈরী। লম্বা লম্বা জানালাগুলো হলদে রঙের। তেলের মত এত মসৃন।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। হাত রাখা অসম্ভব। অথচ প্রাসাদের ছাদগুলো বড় বড় মোটা মোটা কড়ি বর্গায় তৈরী। এই ছাদগুলো সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার গতি অনুসারে প্রাসাদ থেকে সরে যায় এবং বন্ধ হয়। এই প্রাসাদের প্রতিটি ঘর আশ্চর্য রকমের সুন্দর। প্রতিটি ঘরের চারদিকে উজ্জ্বল মুক্তো বসানো। যার একটা আমাদের পৃথিবীর যে কোন দেশের মহারানীর স্বর্ণমুকুটে বসানো যেতে পারে।

সমুদ্রের এই রাজা দীর্ঘ দিন বিপত্নীক। সেই কারণে রাজার মা রাজাকে থাকবার জন্যে একটা আলাদা প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছেন। রাজার মা (যাঁকে সমুদ্রের সকলে রাজ মহিষী বলে) অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি সমুদ্রের এই রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণের জন্যে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। তিনি কথায় কথায় এই রাজপরিবারের গর্বের কথা সকলকে বলে আনন্দ পান। তিনি যেহেতু এই পরিবারের রাজমহিষী, সেই হেতু তিনি মসৃন ল্যাজে বারোটা সুন্দর সুন্দর ঝিনুক পরবার অধিকারিণী। অথচ সেই একই রাজপরিবারের মৎসকন্যারা মাত্র ছ'টা ঝিনুক পরতে পারে। তিনি দেখতেও অতীব সুন্দরী। বেঁটে ছোট্ট-খাট্ট মহিলা। তাঁর বিশেষ গুণ, তিনি সেই রাজপরিবারের মৎসকন্যাদের অত্যন্ত ভালবাসেন এবং নজরে রাখেন। কারণ ওদের মা অনেকদিন আগেই গত। যেহেতু তারা মাতৃহীনা, সেইহেতু তিনি মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাদের ভরিয়ে রেখেছেন। এই পরিবারে ছ'টি মৎসকন্যা আছে। ছোটটি সব চেয়ে সুন্দরী। তার শরীরের ত্বক অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পাত্‌লা। এত পাত্‌লা যে অনেকটা গোলাপের পাপড়ির মত। চোখ জোড়া, অতল সাগরের মত নীল। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, অন্যান্য মৎসকন্যাদের মত তার কোন পা নেই। শরীরের শেষ প্রান্তে মাছের মত একটি ল্যাজ আছে। অর্থাৎ তার শরীর একটি মাছের ল্যাজে এসে শেষ হয়েছে।

সমুদ্রের অতল-তলে রাজপ্রাসাদের বড় বড় ঘরে তারা আপনমনে সারাদিন খেলে বেড়ায়। যে ঘরের দেওয়ালগুলো বিচিত্র ফুলে ফুলে ঢাকা। বড় বড় হলদে রং-এর জানালা গুলো সারাদিন খোলা থাকে। সেই জানালা

দিয়ে নানা রঙ্গিন মাছ সেই ঘরে ঢুকে তাদের সঙ্গে খেলা করে, ও আপন মনে সাঁতার দেয়। আমাদের ঘরের জানালা গুলো কখনও খোলা থাকলে ছোট্ট পাখী গুলো ঘরে ঢুকে যেমন উড়ে বেড়ায়, ওরাও ঠিক তেমনি করে। মাছেরা সোজাসুজি রাজকুমারীদের কাছে সাহস করে চলে যায় এবং তাদের হাত থেকে খাবার তুলে খায়।

রাজপ্রাসাদের সামনে একটা বিরাট সুন্দর বাগান। সে বাগানের গাছ গুলো নানা রঙ্গের। কোন গাছের রং উজ্জ্বল লাল। আবার কোনটা গাঢ় নীল। সে গাছে যে সব ফল ধরে, তাদের রং সোনার মত চক্‌চকে। ফুল গুলো থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে সারা বাগান খানা আলোক-মালায় ভরিয়ে দেয়। ফুলের বোঁটা এবং পাতাগুলো অহরহ খস্‌খসে আওয়াজ তুলে মিষ্টি একটা বাজনা বাজায়। বাগানের মাটিতে সব সময় এক রকমের মসৃন বালি ছড়ান থাকে। যার রং নীল।

প্রত্যেক রাজকুমারীর নিজস্ব প্রাসাদের সামনে এক ফালি করে জমি। সেখানে নিজেদের খুশি মত বাগান। একজন রাজকুমারী তার বাগানে তিমি মাছের মত দেখতে এক প্রকার ফুল ফোটায়। এই ফুল দেখে সে খুব আনন্দ পায়। এবং নিজে খুশি থাকে। অপর রাজকুমারীর বাগানে ছোট ছোট মৎসকন্যার মত দেখতে নানা রং এর ফুল। কিন্তু সব চেয়ে ছোট রাজকুমারীর বাগানে সূর্যের মত লাল ফুল সর্বক্ষণ ফুটে থাকে। সে ঐ ফুল ফোটাতেই ভালবাসে। সেই রাজবংশে ছোট রাজকুমারীই ছিল একমাত্র মেয়ে, যে নিজের বাগানে চুপচাপ সারাদিন একা একা বসে থাকে। এবং নিজের সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করে। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারীরা তাদের নিজেদের বাগানে খেলা করে। তারা একান্তই আত্মমগ্ন বিমুখ।

সমুদ্রের ওপরে চলতি জাহাজের কোন কিছু বা কোন অংশ জলের অতলে তলিয়ে গিয়ে, তাদের বাগানে এসে পড়লে, তারা তখন সেই সব অংশগুলো তুলে নিয়ে আজগুবী গল্প তৈরী করে এবং অপর কে শোনায়। এই সব গল্প নিজেরাও শুনতে ভালবাসে। যে সব গল্পের বেশী অংশই রঙীন কল্পনা মাত্র। কিন্তু ছোট রাজকুমারী তার বাগানের লাল ফুলগুলো

দেখে পৃথিবীর একমাত্র সূর্য ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করে না। তার মনে আসেও না। ফুটন্ত লাল ফুলগুলো সূর্যের প্রতীক বলেই সে মনে করে। তার বাগানে শাদা পাথরের সুন্দর একটি রাজপুত্রের মূর্তি বসানো আছে। সে বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তাকে ঘিরেই তার মনের সমস্ত রঙ্গীন কল্পনা গড়ে তোলে। এই মূর্তিটা কোন এক সময় সমুদ্রগামী একটি জাহাজ থেকে জলে পড়ে যায় এবং শেষে ডুবতে ডুবতে ঐ ছোট রাজকুমারীর বাগানে এসে পড়ে। তখন থেকে এই রাজপুত্রের মূর্তিটা ছোট রাজকুমারীর বাগানেই আছে। সেই মূর্তিটার আশে-পাশে নানা বিচিত্র লতা-পাতার গাছ লাগিয়ে ঐ রাজকুমারী মূর্তিটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

পৃথিবীর কথা শুনতে ছোট রাজকুমারী খুবই ভালবাসে এবং শুনে আনন্দ পায়। এমন আনন্দ সে আর কোন কিছুতেই পায় না। সে, সব সময় তার ঠাকু'মাকে পৃথিবীর নানা গল্প বলতে অনুরোধ করে। সে শুনতে চায় সমুদ্রগামী জাহাজের কথা। পৃথিবীর নানা শহরের কথা। তার লোকজন এবং পশু-পাখীদের কথা। তার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন সে শোনে যে এই পৃথিবীতে যে সব ফুল ফোটে তারা চমৎকার গন্ধ ছড়ায়। কারণ সমুদ্রের অতল-তলে যে সব ফুল ফোটে তাদের কোন গন্ধ নেই। পৃথিবীতে যত বনানী আছে তাদের রং গাঢ় সবুজ ও সেখানকার গাছের পাখীরা আনন্দে গান ও গায়। ঠাকু'মার কাছে এই সব বিচিত্র কথা শুনে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পাখী যে কি প্রকারের জীব ছোট রাজকুমারী জানে না। সেইজন্যে তার ঠাকু'মা পৃথিবীর পাখীদের কথা বলবার সময় 'মাছ' বলে বর্ণনা দেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁর ছোট নাত্নী জীবনে কখনো পাখী দেখেনি। পাখী যে সত্যিকারের কি জীব তা' তার জানা নেই। সেই কারণে ছোট নাত্নীর বোঝবার সুবিধার জন্যে তিনি পাখীর কথা বলবার সময় বলেন 'মাছ'। যেমন: পৃথিবীর গাছে গাছে নানা প্রকার 'মাছ' গান গায়।

ছোট রাজকুমারী অবাক চোখে তাকায় এবং মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শোনে। মাছের গল্প বলতে বলতে ঠাকু'মা সব শেষে তাঁর ছোট নাত্নীকে বলেন:

তোমার পনেরো বছর বয়স হলে তুমি সমুদ্রের ওপরে ওঠবার অনুমতি পাবে। তখন তুমি চাঁদনী রাতে সমুদ্রের গায়ে লাগানো একটি পাহাড়ে বসে জাহাজ চলাচল দেখো। দেখবে কেমন সুন্দর লাগে। তখন তুমি সেই জাহাজের মানুষগুলোকেও দেখতে পাবে। এবং সেই পাহাড়ের আশে-পাশে যে বন এবং শহর আছে সে সব দেখেও তুমি অবাক হয়ে যাবে।

সেই বছরে বড় রাজকন্যার পনেরো বছরে পা দেবার সময় এলো। এই রাজবাড়ীর কন্যারা প্রত্যেকে অপরের থেকে এক বছরের ছোট। সেই হিসাবে ছোট রাজকন্যার সময় আসতে পাঁচ বছর লাগবে। অথচ মাটির পৃথিবী, সমুদ্রের জাহাজ এবং তার নাবিক, বন, পাহাড়-পর্বত ও গ্রাম-শহর দেখবার সখ ছোট রাজকন্যারই সব চেয়ে বেশী।

যাইহোক, যেদিন বড় রাজকন্যার সমুদ্রের ওপরে যাবার অনুমতি মিললো, সে দিন সে তার ছোট বোনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললো যে, সে সমুদ্রের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে বসে আশে-পাশে যে সব জিনিষ দেখতে পাবে তার নিখুঁত বর্ণনা তাকে এসে শোনাবে। এবং যে সব জিনিষ তাকে বেশী আকৃষ্ট করবে, তার কথা সে বিসদ বিবরণ দিয়েই বলবে। কারণ তাদের ঠাকু'মা ওপরের মাটির পৃথিবী সম্পর্কে যে সব কথা বলে, তা'তে ছোট রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয় না। সে আরো শুনতে চায়। অর্থাৎ মাটির পৃথিবী সম্পর্কে ঠাকুমা'র জ্ঞান খুব গভীর নয়। মোটামুটি।

কিন্তু ছোট রাজকন্যাকে জলের অতল-গভীরে অন্যান্য রাজকুমারীদের চেয়ে অনেক বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে। সে তার দিনগুলো তীব্র প্রতীক্ষায় কাটায়। যেন আর কাটতে চায় না। দীর্ঘ পাঁচ বছর সোজা কথা নয়। সে সারা দিনের বেশী ভাগ সময়ই অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তান্বিত থাকে। গভীর রাতে সে একা একা তার রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে ঐ বিশাল এবং গভীর নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ওপরের পৃথিবীর কথা চিন্তা করে। এই পৃথিবীটাকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। বড় বড় মাছেরা ঐ গভীর জলে যখন তাদের শরীর ও ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে ওপরে উঠে যায়, তখন সে ভাবে যে এরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর দিকে যাচ্ছে। ছোট

রাজকন্যা তার প্রাসাদের জানালায় দাঁড়িয়ে ঐ গভীর জলের মধ্য দিয়ে আকাশের চাঁদ ও তারাদেরও দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু জলের নীচে তাদের যে ছবি আসে, তা'তে তাদের তেমন উজ্জলতা থাকে না। এবং তা'রা আকারেও কিছুটা বড় দেখায়। গভীর রাতে যখন আকাশে কাল কাল মেঘ জ'মে তারাদের ঢেকে ফেলে, তখন ছোট রাজকন্যা ভাবে যে নিশ্চয়ই কোন বড় তিমি মাছ তার মাথার ওপরে সাঁতার দিয়ে পৃথিবীর দিকে চলে যাচ্ছে। অথবা কোন সমুদ্রগামী জাহাজ পৃথিবীর মানুষ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কথা মনে হতেই রাজকন্যা মনে মনে কল্পনা করে নেয় যে ঐ সব জাহাজের মানুষগুলো জীবনেও ভাবতে পারবে না যে, জলের অতল-তলে একটি মৎসকুমারী তার শাদা শাদা ছোট ছোট হাত দিয়ে ঐ জাহাজের তলা স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে।

বড় মৎসকুমারী এ বছরে পনেরো বছরে পা দিল। এবারে সে সমুদ্রের ওপরে ওঠবার এবং ভাসবার অনুমতি পেল। এখন সে সমুদ্রের কাছাকাছি কোন পাহাড়ে বসে চাঁদনী রাতে এই মাটির পৃথিবীটাকে ভাল করে দু'চোখ ভ'রে দেখবে।

একদিন বড় মৎসকুমারী সত্যি সত্যি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে ফিরে এল। এবং তার অনেক কিছুই বর্ণনা দিল। তার মধ্যে যে সব জিনিষ তার অত্যন্ত ভাল লেগেছে সেগুলো, সে তার ছোট মৎসকুমারীকে বিশেষ ভাবে জানালো। সে বললোঃ নিস্তব্ধ সমুদ্রতীরে বেলাভূমিতে শুয়ে শুয়ে সামনের বন্দরের শহরটাকে দেখতে তার খুব ভাল লেগেছে। যেখানে আকাশের তারাদের মত অসংখ্য আলো মিটি মিটি জ্বলছে আর নিভ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসা গানের রেশ তাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। সেই শহরের একটানা গাড়ীর আওয়াজ ও সমস্ত মানুষের ঐক্যতান এবং গীর্জার মিনারে বেজে ওঠা ঘণ্টার গুরু গম্ভীর ধ্বনি তাকে খুবই বিস্মিত করেছে। সে অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব দেখেছে। কিন্তু সবই দূরের বস্তু বলে কোনটাই সে স্পর্শ করতে পারে নি। এমনকি তাদের কাছে যেতেও পারে নি।

ছোট মৎসকুমারী তার দিদির কথা শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। এবং মাটির পৃথিবী দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। সে অনেক রাতে তার নিজের প্রাসাদের জানালায় দাঁড়িয়ে দিদির কথা গুলো একমনে ভাবতে লাগলো। এবং সেই গভীর নীল জলের মধ্য দিয়ে মাটির শহরের ব্যস্ততা, গাড়ীর আওয়াজ এমনকি গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনিও কল্পনায় অনুভব করতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো যে কবে তার দিন আসবে। সে ওপরে গিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে পারবে।

পরের বছরে দ্বিতীয়া মৎসকুমারীর জলে ভাসবার অনুমতি মিললো। এবং ইচ্ছানুযায়ী সাঁতার দেবার সুযোগ এল। সে ঠিক সন্ধ্যা-লগ্নে জলের গভীর তলদেশ থেকে ওপরে উঠে এল। পৃথিবীর এই সন্ধ্যা-লগ্নের ভাব-গম্ভীর সুর ও দৃশ্য, তাকে অতিমাত্রায় অভিভূত করল। সে অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষার পর অতল জলের গভীরে ফিরে গিয়ে ছোট কন্যাকে বললো যে সোনা-ঝরা সন্ধ্যায় আকাশে মেঘের সৌন্দর্য কল্পনাতীত। বর্ণনা করা কঠিন। সে বললো ঃ' লাল এবং ভাওলেট রং-এর মেঘের দল তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উড়ে যেতে লাগলো। সমুদ্রের বুকে অস্তমিত সূর্যের লাল আভায় স্নান করে দুটি বন্য রাজহংস সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো। এ এক অনবদ্য দৃশ্য। মাঝে মাঝে তারও ঐ অস্তমিত সূর্যের দিকে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সূর্য অস্তমিত। এবং সমুদ্রের বর্ণাঢ্য কলতান ও প্রায় বিলীয়মান! সেইজন্যে সে সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আঁধারে অবাক চোখে তাকিয়ে সেই সব দৃশ্য দেখে দেখেই সময়টা কাটিয়ে দিল। এক কথায় সে পৃথিবীর স্পর্শে এবং সৌন্দর্যে অভিভূত।

পরের বছরে তৃতীয়া কন্যার বাইরে যাবার সময় এল। অন্যান্য বোনদের মধ্যে সে একটু বেশী সাহসী। সে সমুদ্রের ওপরে এসেই সাঁতরে একেবারে নদীর মুখে চলে গেল। সামনেই আঙ্গুর ফলে ঢাকা একটা সুন্দর সবুজ পাহাড়। সে উঁকি দিয়ে সেখানকার রাজপ্রাসাদ ও দুর্গটাকে ভাল করে দেখে নিল। সে ঐ পাহাড়ের গাছে গাছে পাখীদের কলতান ও শুনতে

পেল। কিন্তু সূর্য তখন একেবারে মাথার ওপরে থাকার জন্যে প্রখর রৌদ্রে তার শরীরে অসম্ভব তাত্ লাগতে লাগল। সেইজন্যে সে সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে, শরীর ঠাণ্ডা করবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নদীর যে অংশ শহরের ভেতরে প্রবেশ করেছে তার গায়ে গায়ে সে একদল স্কুলের ছাত্রকে দেখতে পেল। তারা উলঙ্গ হয়ে স্নান করছে এবং একে অপরের গায়ে জল ছিটিয়ে খেলা করছে। মৎস্যকন্যাটির ভারী ইচ্ছে হ'ল তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে। কিন্তু স্কুলের ঘণ্টা পড়ে যাবার জন্যে তারা খেলা ফেলে ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড় হাল্‌কা হয়ে এল এবং সেখানে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পর একটা কালো জন্তুকে সেখানে জল খেতে আসতে দেখা গেল। (সম্ভবতঃ সেটা কুকুর। কারণ এই ধরণের জন্তুর আকার-প্রকৃতির কথা সে আগে শুনেছিল। কিন্তু চোখে দেখেনি)। তাকে দেখে মনে হল এটা কুকুর হওয়াই স্বাভাবিক। জন্তুটা তাকে দেখে এমন একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে তেড়ে এল যে, সে অসম্ভব ভীত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে লাগলো। মাটির পৃথিবীতে সে, যে সব জিনিষ দেখেছে তার মধ্যে সবুজ বন এবং পাহাড়, ছোট ছোট শিশুদের জল নিয়ে খেলার দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারবে না। কারণ এই সব পার্থিব দৃশ্য তার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। সব চেয়ে তার আশ্চর্য লেগেছে ঐ সব শিশুদের মাছের মত কোন ল্যাজ নেই দেখে। কিন্তু তবুও তারা অনায়াসেই জলে সাঁতার দিতে পারে।

চতুর্থ কন্যার সাহস অন্যান্যদের তুলনায় কম। তার ভাসবার সময় আসতে সে সাগরের মাঝখানে ভেসে উঠে আর এগিয়ে যেতে সাহস পেল না। সে ওখান থেকেই পৃথিবীটাকে এক নজরে দেখে নিয়ে ফিরে এসে বললো: জলে ভেসে উঠে এক মাইলের মধ্যে যা' দেখতে পেয়েছে তাতে বলা যায় যে পৃথিবীটা দেখতে ভালই। মাথার ওপরে আকাশখানা কাঁচের মতই স্বচ্ছ। সে কিছু জাহাজকেও সমুদ্রে ভেসে যেতে দেখেছে। তবে সবই দূর থেকে।

এবারে পঞ্চম কন্যার সময় এল। অর্থাৎ সে পনেরোতে পা দিল। সেটা ছিল শীতকাল। এবং তার জন্মের মাস। রাজপ্রাসাদে খুব ধুমধাম করে তাঁর জন্মদিন পালন করা হল। সেই আনন্দ-উৎসবেই সে ওপরে ওঠবার অনুমতি পেল। সুতরাং সে ওপরে উঠে পৃথিবীর চেহারাটা যে ভাবে দেখতে পেল অন্যান্য মৎস্যকন্যারা সে সব জিনিষ দেখতে পায়নি। তখন সমুদ্র ছিল ঘন সবুজ। শীতে জমাট বাঁধা বড়বড় ভাসমান তুষার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রত্যেকটা দেখতে ছিল ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মত। এবং এক একটা এত বড় যে কল্পনা করা যায় না। মানুষেরা পৃথিবীর মাটিতে যে গীর্জা তৈরী করে অনেকটা প্রায় তারই মত। আকারে অমসৃন এবং পরিধিতে এলোমেলো। তবে হীরকের মত তার দ্যুতি। সে সব চেয়ে বড় ভাসমান তুষারের ওপর বসে পৃথিবীটাকে ভাল করে দেখতে লাগলো। বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজগুলো ভীতিবহ শব্দ করে এবং প্রকাণ্ড ঢেউ তুলে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগলো। তা'তে ভাসমান তুষারগুলো সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ লেগে নাচতে নাচতে ওপরে উঠে আবার পরক্ষণেই নীচে নেমে আসতে লাগল। দূর থেকে এদের এই খেলা দেখতে অত্যন্ত চমৎকার। সেই সময় পৃথিবীর বাতাস তার সুন্দর চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারাটা হঠাৎ পালটে গেল। আকাশে ঘন ঘন মেঘ জমে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশখানা বজ্রপাতে চৌচির হয়ে যেতে লাগলো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো। সমুদ্রের চেহারা গভীর কাল হয়ে উঠলো। ভাসমান তুষারগুলো ঢেউয়ের দোলায় এত ওপরে উঠে যেতে লাগলো যে দেখে মনে হল ওরা হাত বাড়িয়ে আকাশে ঠিক্‌রে পড়া বিদ্যুতের টুকরোগুলোকে ধরবার চেষ্টা করছে। সমস্ত সামুদ্রিক জাহাজগুলো জলমগ্ন পাহাড়ে আটকে যেতে লাগলো। জাহাজের আরোহীরা আর্ত চিৎকারে আকাশ ভরিয়ে তুলতে লাগলো। অথচ সে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে একটা বিরাট ভাসমান তুষারে বসে আকাশ, পৃথিবী এবং সমুদ্রের মিলিত আলোর ঝলকানি

আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগলো। এবং শেষে এক সময় ফিরে এল।

অন্যান্য মৎসকন্যারা সকলেই প্রথমবারে সমুদ্রে ভেসে উঠে পৃথিবীর চেহারা দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিল। এবং ফিরে এসে বেশ ফলাও করে গল্প করেছিল। কিন্তু তারপর এক মাসের মধ্যে বার বার ওপরে যাবার ফলে এবং মাটির পৃথিবীকে বিভিন্ন রূপে এবং পরিবেশে উপভোগের ফলে সেখানকার আকর্ষণ তাদের কাছে কমে যেতে লাগল। শেষের দিকে তারা একথাও স্বীকার করলো যে পৃথিবীর চেয়ে জলের অতল গভীরে বাস করাই বেশী আনন্দদায়ক।

এরপর সূর্য ডোবা কোন কোন সন্ধ্যায় পাঁচ বোনে একত্রে হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে জলের ওপরে ভেসে যেত। মানুষের কণ্ঠস্বরের চেয়ে তাদের গলার স্বর এবং সুর ছিল আরো ভাল। তারা গান গেয়ে গেয়ে সারা সমুদ্রে ভেসে বেড়াত এবং যখন আকাশে ঝড়ের আভাস পেত তখন সাঁতরে জাহাজের যাত্রীদের কাছে গিয়ে তাদের ভাষায় গান গাইতো, সাবধান করত এবং জলের তলায় চলে আসতে অনুরোধ জানাতো। কিন্তু জাহাজের নাবিকরা তাদের কথা ও গানের অর্থ বুঝতে পারতো না। তারা ওদের দেখলেই একটা অশুভ সঙ্কেত বলে ধরে নিত। ভাবতো এবারে ঝড় উঠবে। আকাশখানা চৌচির হয়ে সমুদ্রে ফেটে পড়বে। ফলে জাহাজ ডুববে। তারা ডুববে। এবং তাদের মৃতদেহগুলো সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে।

যখন পঞ্চকন্যা একত্রে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের ওপরে চলে যেত তখন ষষ্ঠকন্যা বা শেষ কন্যা নীরবে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। তাদের বেশভূষা ও সাজ-গোজ দেখতো। কান্নায় তার বুক ভরে উঠতো। কিন্তু যেহেতু মৎস্যকন্যারা কাঁদতে পারেনা এবং চোখের পাতায় জল আসে না সেইহেতু সে কাঁদতে পারতো না। তবে বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে তাদের বিদায় জানাতো এবং নিজের শুভদিনটির জন্যে অপেক্ষায় থাকতো।

সে বার বার ওদের বলতো : আমার যখন পনেরো বছর বয়স হবে,

যখন ওপরে যাবার অনুমতি মিলবে, তখন আমার বিশ্বাস আমি ওপরের পৃথিবী ও তার গাছ-পালা, পশু-পাখী ও মানুষদের ভালবাসতে পারবো। আমি আশা করি মাটির পৃথিবী আমার কাছে ভালই লাগবে।

অবশেষে একদিন শেষ কন্যা পনেরোতে পা দিল। রাজপ্রাসাদের রাজমহিষী অর্থাৎ ওদের ঠাকু'মা একদিন শেষ কন্যাকে ডেকে বললেন: তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ। তোমাকে এখন পঞ্চদশী বলা যেতে পারে। সুতরাং তুমি এখন সমুদ্রের ওপরে ভেসে বেড়াবার অনুমতি পেলে। অতএব এসো, তোমাকে এবারে শেষ বারের মত মনের মত করে সাজিয়ে দি'। এই কথা বলে, 'তিনি তাকে কাছে ডেকে তাঁর মনের মত করে সাজাতে সুরু করলেন। তিনি শেষ রাজকন্যার চুলে শাদা লিলি ফুলের মালা জড়িয়ে দিলেন। দূর থেকে দেখলে যার প্রতিটি পাপড়ি অর্দ্ধ মুক্তোর মত দেখতে লাগবে। তিনি মৎসকন্যার ল্যাজে আটটি বড় বড় ঝিনুক বসিয়ে দিলেন। যা'তে তার রূপকে আরো উজ্জ্বল করে।

ঠাকু'মার সাজানো দেখে ছোট মৎসকন্যা বললো: ঠাকু'মা, তুমি যে আমাকে এত করে সাজিয়ে দিচ্ছ, এতে কিন্তু আমি ভয়ানক ব্যথা পাচ্ছি। আমার চলতে কষ্ট হচ্ছে। সুতরাং সাঁতার দিতে আমার আরো কষ্ট হবে।

ঠাকু'মা বললেন: রূপকে বাড়াতে গেলে কষ্ট করতে হয়। আবার রূপ না বাড়ালে মেয়েদের রূপসী বলা চলে না। তুমি যদি তোমার রূপকে বাড়াতে চাও তবে একটু কষ্ট করতেই হবে।

ঠাকু'মার কথা শুনে ছোট মৎসকন্যা মনে মনে ভাবতে লাগলো: এতে তার রূপ বাড়বে না আরো কিছু। অকারণ শরীরটাকে ভারী করে তুলবে। এর চেয়ে আমার বাগানের লাল গোলাপে আমাকে মানায় বেশী। ছোট রাজকন্যার মনে হল যে, সে এইসব চাকচিক্য পূর্ণ জিনিষগুলো খুলে ফেলে বাগানের লাল গোলাপে আবার নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয়। কিন্তু ঠাকুমা'র ভয়ে তা' করতে সাহস পেল না।

ঠাকু'মার সাজানো শেষ হতে সে নিজের বাগানে এসে সমস্ত গাছ-পালা, তরুলতা ও নানা রং-এর বাহারী ফুলের কাছে অস্ফুট একটা কান্নার

সুরে বিদায় নিল। কারণ এটা তার শেষ বিদায়ও হতে পারে। যদি সমুদ্রের বুক থেকে সে আর ফিরে না আসতে পারে। যদি ঐ মাটির পৃথিবীর কোন অশুভ সংকেত তাকে ঘিরে ধরে।

শেষ মৎসকন্যা সকলের কাছে বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের অতল দেশ থেকে ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়ে ওপরে আসবার চেষ্টা করতে লাগলো। এবং শেষে নিজের দেহটাকে হালকা করে ভাসিয়ে ওপরে নিয়ে এল।

সে যখন সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপরে তার মাথা তুললো তখন সূর্য তার সারা দিনের কিরণ বিকিয়ে প্রায় অস্তমিত। কিন্তু আকাশ তখনো রক্তিম। আলোর ঝালোর তখনো সারা আকাশে ছড়ানো। মহাকাল সোনালী রং-এ তুলি ডুবিয়ে আকাশে এলো মেলো রং ছড়াচ্ছে। বিশাল আকাশের রক্তিম গোলাপী আভা সন্ধ্যার সমস্ত সৌন্দর্যকে জোতির্ময় করে তুলেছে। সেই মুহূর্তে সে অঞ্চলের পরিবেশ শেষ মৎসকন্যার কাছে অত্যন্ত মধুর ও মিষ্টি বলে মনে হতে লাগলো। তখন সমুদ্রের চেহারাও ছিল অত্যন্ত শান্ত ও ধীর। সেই শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে দূর থেকে একটা বড় জাহাজ মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে এগিয়ে আসছিল। সেই জাহাজের তিনটি মাস্তুলের মধ্যে মাত্র একটি বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছিল। বাতাস এত শান্ত ছিল যে নাবিকেরা ডেকের ওপরে পরম আনন্দে গান-বাজনা করছিল। সমুদ্রের ভয় তাদের মনে একটুও ছিল না। তারপর যখন সন্ধ্যা পার হয়ে সমুদ্রে রাত নেমে এল, তখন জাহাজে সমস্ত দেশের পতাকার সঙ্গে প্রায় শ'খানেক হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

ছোট মৎসকন্যা সে সব দৃশ্য অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলো। হ্যারিকেনের আলো গুলো দেখে তার মনে হল যে গভীর অন্ধকার ভেদ করে ঐ আলো গুলো যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আছে। সে তার মনের উচ্ছাস্ আর চেপে রাখতে না পেরে সাঁতার দিতে দিতে ঐ জাহাজের কেবিনের জানালার কাছে এসে চুপিসারে ভেতরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো। এটা তার অদম্য কৌতুহল। পৃথিবীর মানুষদের সম্পর্কে তার জানবার ইচ্ছা বহু দিনের। সে, জাহাজের সামনে এগিয়ে এসে সুন্দর

পোষাকপরা একদল নাবিককে দেখতে পেল। এবং দেখেই বুঝলো যে সুন্দর পোষাক পরা নাবিকদের মধ্যে যে সব চেয়ে সুন্দর এবং যার পোষাক অত্যন্ত দামী সেই সুদর্শন তরুনই হচ্ছে রাজপুত্র। ছোট রাজকন্যা আরো কাছে এগিয়ে এসে তাকে ভালকরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো। রাজপুত্রের চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত কাল এবং টানা টানা। মৎসকুমারী অনুমানে বুঝলো যে এখানে এরা রাজপুত্রের জন্ম দিন পালন করছে। এবং আনন্দে বাজনা বাজছে। এখানে গান-বাজনা ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। যার সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। মৎসকন্যা নাবিকদের জাহাজের ওপরে নৃত্য করতে দেখতে পেল। এবং রাজপুত্র যখন জাহাজের কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে দাঁড়ালো তখন নাবিকেরা একশো'টা বাজি পোড়ালো। আকাশখানা আলোক মালায় ভরিয়ে দিল। সেই সব বাজির আওয়াজে মৎসকুমারী এত ভয় পেল যে, সে আর অপেক্ষা না করে জলের অতলে নেমে গেল। কিন্তু মনের কৌতুহল তার তখনো মেটেনি। সে একটু পরেই আবার ভেসে উঠলো। তখন ঝক্‌ঝকে আকাশে মিটি মিটি তারা জ্বলছে। আদিগন্ত সাগরে চাঁদের আলোর বন্যা বইছে। যে সব বাজি ঐ নাবিকেরা পোড়ালো তার এমন আওয়াজ সে জীবনে শোনেনি। যেন আকাশের বিরাট সূর্যটা চৌচির হয়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে জলে এসে পড়ছে। সামুদ্রিক মাছেরা ভয়ে এলোমেলো ঢেউ তুলে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। জাহাজের আলোগুলো মাঝে মাঝে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নাবিকদের বাজনা এবং গানের স্বর ও সুর অপূর্ব এক মুর্চ্ছনা নিয়ে ভেসে আসতে লাগলো। কিন্তু আর দেরী করা চলে না। তাহলে ঠাকু'মা ভাবতে বসে যাবেন। সুতরাং এবার তার ফেরার পালা। কিন্তু ফিরি ফিরি করেও সে ফিরতে পারলো না। তার চোখ দুটো ঐ সুন্দর রাজপুত্রকেই ঘিরে রইল। তার মনে হতে লাগলো আর একটু ভাল করে দেখে যাই। কী আর এমন দেরী হবে। হয়তো সারা জীবনেও এমন সুন্দর রাজপুত্রকে সে আর দেখতে পাবে না। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। ডেকের ওপরে নানা রং-এর আলোগুলো নিভিয়ে

দেওয়া হতে লাগলো। আকাশে রকেট ছাড়া অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বাজি পোড়ানোও শেষ। কামানের গর্জন ও আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু মৎসকন্যা অবাক হয়ে দেখলো যে সমুদ্রের গভীরে ঘন কাল জল যেন অকারণ তোলপাড় করে উঠছে। অকারণ পর্বত প্রমান ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তবুও সে নিজেকে ভাসিয়ে ঐ কেবিনের কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ জাহাজটা দ্রুত চলতে সুরু করলো। মাস্তলগুলো একটার পর একটা খাটিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। ঢেউগুলো আগের চেয়ে অনেক বড় এবং উঁচু হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মৎসকন্যা আকাশে চোখ তুলে তাকালো। ঘন মেঘ সারা আকাশ জুড়ে গুরু গুরু ডাক ছাড়ছে। তারপর শুরু হল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। বিদ্যুতের আলোর ঝলক্ সারা আকাশ মাতিয়ে বেড়াতে লাগলো। মৎসকন্যা বুঝলো যে প্রচণ্ড একটা ঝড় আকাশ জুড়ে এগিয়ে আসছে। এবং মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। নাবিকেরা তাদের জাহাজ আরো দ্রুত নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বিশাল সমুদ্রের জলমগ্ন পাহাড়ে আটকে যাবার সম্ভাবনায় জাহাজের গতি বাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। একখানা শাদা কাপড়ের মত পড়ে থাকা সমুদ্রে, জাহাজের নাবিকেরা ধাঁধাঁয় পড়ে যেতে লাগলো। কোন পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে। কোন পথে বিপদের সম্ভাবনা কম, সেটা তারা বুঝতে পারছিল না। বিশাল সমুদ্র-তরঙ্গ বিরাট আকারের কাল কাল পাহাড়ের মত স্ফীত হয়ে গর্জন করতে করতে জাহাজের মাস্তুল পর্যন্ত উঠে যেতে লাগলো। জাহাজখানাও সেই বিশাল ঢেউয়ের তালে তাল রেখে একবার সমুদ্র-তরঙ্গের চূড়ায় উঠে আবার রাজহাঁসের মত নীচে নেমে আসতে লাগলো। সমুদ্রের এই দৃশ্য দেখে নাবিকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়তে লাগলো। এবারের যাত্রা তাদের কাছে অশুভ বলেই তারা মনে করলো। তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছুবার অনিশ্চিয়তা দেখা যেতে লাগলো। সমুদ্রের বুকে যখন এত সব কাণ্ড ঘটতে লাগলো, তখন ছোট মৎসকন্যাটি মনের আনন্দে সাঁতার দিতে লাগলো। তার মনে লেশ মাত্র ভয় দেখা দিল না। সে অবাক্ চোখে জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো।

নাবিকেরা যে সত্যিই ভয় পেয়েছে এবং তাদের যে জীবন-সঙ্কট দেখা দিয়েছে এটা তার মনেই এল না। সে ভাবলো, সমুদ্রে জাহাজ বুঝি এমন করেই চলে! এটাই সমুদ্রগামী জাহাজের স্বাভাবিক গতি। নাবিকেরা বুঝি সমুদ্রে জাহাজকে এমনি করেই চালায়। কিন্তু এদিকে ক্রমাগত ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে লেগে জাহাজের তলার মোটা কাঠগুলো সরে যেতে লাগলো। বড় বড় ফাটল তৈরী হতে লাগলো। শেষে সেই ফাটল আরো বড় হতে হতে গর্তের আকার ধারণ করলো এবং তোড়ে জল ঢুকতে লাগলো। তখন সকলের নিরুপায় অবস্থা। জলের চাপে জাহাজ এক দিকে হেলে গিয়ে ডুবতে শুরু করলো। জাহাজ প্রায় ডোবে আর কি। এবারে মৎসকন্যাটি বুঝতে পারলো যে নাবিকেরা সত্যিই বিপদে পড়েছে। তাদের চোখে মুখে ভয়ের ছবি। তখন মৎসকন্যাটি ধীরে ধীরে ঢেউ কেটে কেটে জাহাজের কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো যে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে জাহাজের ভেঙ্গে পড়া বড় বড় ভারী ভারী কাঠ বা তক্তাগুলো খুলে গিয়ে নাবিকদের আঘাত না করে। কিন্তু চারিদিক এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। পরক্ষণেই এক অস্বাভাবিক বিদ্যুতের ঝলকানিতে জাহাজের ওপরে মানুষগুলোকে সে পলকের জন্যে প্রত্যক্ষ করতে পারলো। কিন্তু এটাই শেষ বারের মত। মুহূর্তে জাহাজ-খানা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়লো। সে হঠাৎ অনুভব করলো যে ঐ জাহাজের রাজপুত্র সমুদ্রের অতলে ডুবে যাচ্ছে। মৎসকন্যা আর দেরী না করে তখনই তার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেতে লাগলো। কিন্তু অস্বাভাবিক ঢেউয়ের তোড়ে তা' সম্ভব হ'ল না। শেষে দেখা গেল রাজপুত্র অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মৎসকন্যা একবার ভাবলো যে এই রাজপুত্রকে তার নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে পৃথিবীর মানুষেরা জলে বেশীক্ষণ বাঁচে না। নিশ্বাস নিতে পারে না। এই কথা মনে হতেই সে ঐ বিশাল তরঙ্গ উপেক্ষা করে ভাসমান একটা কাঠের সাহায্যে রাজপুত্রের কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সেই

মুহুর্তে সে ভুলে গেল যে, এই বিপদ তারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সে সঙ্গে সঙ্গে সাগরের অতলে একটা ডুব দিল এবং এক ডুবে রাজপুত্রের সামনে এসে হাজির হল। রাজপুত্র ঐ সাগর-তরঙ্গে লড়াই করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার পা দুটো এবং বাহু অসাড় হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটি ঘুমন্ত মানুষের মত বন্ধ। রাজপুত্র সেই মুহূর্তে সত্যিই মারা যেত, যদি ঐ মৎসকন্যাটি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতো। সে রাজপুত্রের মাথাটা ঢেউয়ের ওপরে তুলে ধরে আস্তে আস্তে সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়ে ভাসিয়ে এগিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ভোরের দিকে ঝড় থামলো। কিন্তু জাহাজের কোন চিহ্ন সেই সমুদ্রে দেখা গেল না। এমন কি এক টুকরো কাঠ ও না। ধীরে ধীরে সেই সমুদ্রে বিশাল এক থালার মত লাল সূর্য হামা দিয়ে উঠে এল এবং শান্ত সাগরে আলোর ঝালর ছড়িয়ে দিতে লাগল। সে রোদের রেখা রাজপুত্রের মুখে এসেও পড়তে লাগলো। কিন্তু তবুও তার চোখ দুটি বন্ধ। মৎসকন্যা রাজপুত্রের সুন্দর কপালে তার ঠোঁট স্পর্শ করলো। এবং তার ভিজে চুল দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করতে লাগলো। তার বার বার মনে হতে লাগলো যে রাজপুত্র নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে। সে তার জীবন আবার ফিরে পাবে। মৎসকন্যা আবার তার কপালে এবং গালে তার ঠোঁটের স্পর্শ রাখলো। এই রাজপুত্রকে দেখে মৎসকন্যার বার বার তার বাগানের রাজপুত্রের মুর্ত্তিটাকে মনে পড়তে লাগলো। কারণ এই রাজপুত্রের মুখের আদল অনেকটা তার মত ছিল।

মৎসকন্যা রাজপুত্রকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে সমুদ্রের অনেকটা পথ পার করে নিয়ে এল। দূরে সে এক খণ্ড জমিও দেখতে পেল। তার গায়ে বিশাল এক নীল পাহাড়ও তার নজরে এল। যার চুড়া শাদা রাজহংসের মত তুষারে ঢাকা ছিল। নীচে সেই পাহাড়ের গা' ঘেঁসে এক সুন্দর সবুজ বন। সেই বনের সামনে-একটা বড় গীর্জা অথবা কোন বিদ্যালয়ের বাড়ীও দেখা গেল। মৎসকন্যা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলো না যে ওটা গীর্জা না বিদ্যালয়ের বাড়ী। তবে কিছু একটা যে হবে এটা নিশ্চিত্। মৎসকন্যা

এ ভেবে আশ্বস্ত হল যে, এখানে কোন গীর্জা বা বাড়ী যদি থাকে, তবে পৃথিবীর মানুষের ও দেখা পাওয়া যাবে। কাছে আসতে বোঝা গেল এটা একটা কমলালেবুর বাগান। স্কুল বাড়ীর বিরাট ফটকের দু'পাশে বড় বড় পাম্ গাছের সারি। গভীর সমুদ্রের কিছু অংশ এইখানে এসে ছোট একটি নদীর আকার নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। এবং সেই বনের সীমানায় এসে শেষ হয়েছে। যেখানে জলের গভীরতা বেশী নয়। মৎসকন্যা ধীরে ধীরে রাজপুত্রকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বালির পাড়ে নিয়ে এসে, একটি উঁচু জায়গায় মাথা দিয়ে শুইয়ে দিল। এবং নিজে বসে পড়ল। এত ক্লান্তি সে আগে কখনো অনুভব করে নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ বাড়ী থেকে ঘণ্টা-ধ্বনির আওয়াজ পাওয়া গেল। একদল ছোট ছোট মেয়ে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে ছোটাছুটি করতে লাগলো। মৎসকন্যা তখন রাজপুত্রকে ঐ বেলাভূমিতে শুইয়ে রেখে নিজে সাঁতরে কিছুটা দূরে সরে এল এবং জলের কাছে একটা বড় পাথর ও অপর্যাপ্ত ফেনার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। সে মাঝে মাঝে তার মুখ বাড়িয়ে চুপিসারে দেখতে লাগলো যে কোন মানুষ বা ঐ দলছুট্ কোন মেয়ে রাজপুত্রকে সাহচর্যের জন্য এগিয়ে আসে কিনা।

খুব বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই একজন মহিলা সেখানে এগিয়ে এলেন। তিনি রাজপুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখে, প্রথমে ভীত এবং অবাক হলেন। তারপর লোকজন ডাকলেন। তারা সকলে রাজপুত্রকে সেবা-শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষার পর রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরে এল। সে তার আশ-পাশের লোকজনকে দেখে প্রথমে খুব অবাক হল এবং পরে হাসলো। কিন্তু রাজপুত্র তার দিকে একবারও ফিরে তাকাল না এমন কি সে জানলো না যে, সে তার জীবন দান করেছে এবং সমুদ্রের ধারেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। তার স্বভাবতই মনটা বিষণ্ণ হয়ে এল। সে দেখলো যে তারা রাজপুত্রকে সামনের সেই বড় বাড়ীটাতে নিয়ে গেল। মৎস্যকন্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার মনটা ভারী হয়ে এল।

সে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অতলে ঝাঁপ দিল এবং নিজের প্রাসাদে ফিরে এল।

এই ছোট মৎসকন্যাটি চিরকালই অত্যন্ত শান্ত এবং একা থাকতে ভালবাসে। নির্জনতা তার চিরকালের সঙ্গী। তখন এই নিঃসঙ্গতা আরো বাড়লো। অর্থাৎ তখন সে সারা সময় একা একাই থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। মেলামেশা করে না। দেখলে মনে হয় সে যেন সব সময়ই গভীর এক চিন্তায় মগ্ন। তার অন্যান্য বোনেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। জানতে চায়। এবং সমুদ্রের ওপরে গিয়ে সে কি দেখলো সেটা জানবার জন্যেও কৌতুহল প্রকাশ করে। কিন্তু সে তাদের কোন কিছুই বলে না। এমন কি কথার কোন জবাবও দেয় না।

এরপর সে অনেক সন্ধ্যা এবং সকাল ঐ বেলাভূমির পাড়ে এসে একা একা চুপ করে বসে থেকেছে। রাজপুত্রকে আবার দেখতে পাবার আশায় অপেক্ষা করেছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। এই ভাবে আশায় আশায় দিন পেরিয়ে মাস এবং মাস পেরিয়ে বছরে পা দিয়েছে। ঋতুর পালা-বদলের সাথে সাথে তাঁর বাগানের সমস্ত কাঁচা ফল পেকে উঠেছে। মালীরা সে গুলো তুলে ঘরে নিয়ে গেছে। শীতে বাগান তুষারে ঢেকে গেছে। আবার গরমে পাহাড়ের চুড়া থেকে তুষার গলতে গলতে নীচে নেমে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মৎস্যকন্যা ঐ রাজপুত্রের চিন্তায় এবং আশায় বছর পার করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে হয়েছে। এক বুক হতাশ ও ভারবহ মন নিয়ে সে নিজের প্রাসাদে বার বার ফিরে এসেছে। তার এই বিরাট দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তারই বাগানের রাজপুত্রের মুর্তিটা। যেটা দেখতে অনেকটা ঐ রাজপুত্রের মত। ছোট মৎসকন্যা সমুদ্রের ওপর থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বার বার তার বাগানে চলে আসতো এবং সেই মুর্তিটাকে নিজের হাতে সেবা করে আনন্দ পাবার চেষ্টা করতো। মুর্তিটার আশে-পাশে নানা বাহারী পাতার গাছ লাগিয়ে তাকে শীতল ছায়া জোগান দিত। যা'তে মুর্তিটার রৌদ্রে কোন কষ্ট না হয়।

অবশেষে সেই ছোট মৎসকন্যা আর থাকতে না পেরে একটি বোনকে কাছে ডেকে বাগানে নিয়ে গেল এবং তার মনের কথা সব খুলে বললো। সে শুনে অবাক। তারপর সে নিজেও তার ছোট বোনের গোপন কথাগুলো অন্য বোনদের জানালো। তারা আবার অন্যদের জানালো। এই ভাবে সে রাজ্যের সকলের কাছেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তার মধ্যে একটি বোন অনেক চিন্তা করে বললো যে, সে প্রথম বারে যখন সমুদ্রের ওপরে বেড়াতে যায় তখন একটি জাহাজে এই রাজপুত্রকে দেখেছে। এবং তার রাজ্যটাও তার জানা আছে।

আর যাবে কোথায় ? ছোট মৎসকন্যা তাকে ধরে বসলো যে, ঐ রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদটা একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। বোনটিও রাজী। তখন একদিন সব বোনেরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে তাদের ছোট বোনকে নিয়ে ওপরে গেল। সেই রাজপুত্রের সুন্দর ও মনোহারী প্রাসাদটি দেখিয়ে দেবার জন্যে।

সেই প্রাসাদটি ছিল উজ্জ্বল হলদে রংয়ের। সারা গায়ে যে মার্বেল পাথর বসানো ছিল, তার রং সূর্যাস্তের লাল আভার মত। প্রাসাদটি এমন ভাবে গড়া যে তার কিছু অংশ সমুদ্রের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। এবং এর সিঁড়িগুলো সমুদ্রে এসে মিশেছে। এ প্রাসাদের ছাদের রং ছিল কিছু অংশ সোনালী এবং কিছু অংশ গোলাপী। এই বিশাল প্রাসাদের চারিদিক নানা বিচিত্র ধরনের মার্বেল মূর্তিতে ঘেরা ছিল। ঘরের সমস্ত জানলাগুলো ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও শাদা। সারা ঘর সিল্কের কাপড়ে মোড়া। এবং সারা দেওয়াল জুড়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। যার দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো অসম্ভব। অর্থাৎ কেউ চোখ ফেরাতে পারে না।

বোনেরা ছোট মৎসকুমারীকে সে প্রাসাদের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। ছোট মৎসকন্যা সারাদিন সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে দেখে নিল প্রাসাদের কোন ঘরে সেই রাজপুত্র বাস করে। তারপর তার দেখা পাবার আশায় অনেক সন্ধ্যা এবং অনেক রাত্রি সেই প্রাসাদ সংলগ্ন

সমুদ্রে কাটালো। সে সাঁতার কেটে একেবারে প্রাসাদের কাছাকাছি চলে গেল। যেখানে আসতে এর আগে কেউ সাহস করেনি। কিন্তু তা'তেও যখন সে রাজপুত্রের দেখা পেল না, তখন সে একদিন একটা খাল (একেবারে রাজপ্রাসাদের ঝুল-বারান্দায় এসে শেষ হয়েছে) বেয়ে একেবারে ঝুল-বারান্দার নীচে চলে এল। এখানে সেই ঝুল-বারান্দার ছায়া, জলে এসে পড়েছে। সে দিনরাত ঐ ঝুল-বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে রাজপুত্র নিশ্চয়ই নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে কোন এক চাঁদনী রাতে এই ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। এবং তাকে দেখতে পাবে।

কয়েকদিন পরেই তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। সে রাজপুত্রকে পরপর কয়েকটি চাঁদনী রাতে একটি ছোট্ট নৌকাতে সেই নদীতে ভেসে বেড়াতে দেখতে পেল। সেই নৌকাতে অনেকগুলো পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। এবং রাজকুমার বসে বসে বাজনা উপভোগ করছিল। রাজকুমারকে আড়াল করবার জন্যে ছোট মৎস্যকন্যা একটা নলবনে নিজেকে গোপন করলো। এই সময় যদি কেউ তাকে দেখতে পেত, তবে তাকে সুন্দর শাদা একটা রাজহংস বলেই ভুল করতো।

অনেক রাতে জেলেরা যখন আলো ফেলে ঐ নদীতে মাছ ধরে, তখন তারা ঐ রাজকুমারের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলে। যা' শুনে সেই মৎসকন্যা অকারণ একটা পুলক অনুভব করে। রাজপুত্রকে সমুদ্র থেকে রক্ষা করবার বিশেষ দিনটির কথা তার মনে পড়ে। সেদিনের সমুদ্রের সেই আকাশ চুম্বি ঢেউ ও অর্দ্ধমৃত রাজপুত্রকে বাঁচাবার একটা অদম্য ইচ্ছার কথা তার ছবির মত মনে পড়ে যায়।

ক্রমাগত রাজপুত্র ও মাটির মানুষদের দেখতে দেখতে সে কেমন যেন নিজের অজ্ঞান্তেই তাদের ভালবাসতে শুরু করলো। সে অনেক সময় সাঁতার দিয়ে একেবারে তাদের পাশে চলে যেত। পৃথিবীর আলো, বাতাস, প্রকৃতি ও তার মানুষদের দেখতে দেখতে তার একটা বদ্ধ ধারণা হল যে, এই পার্থিব জগৎ তাদের অতল জলের জগৎ থেকে হাজার গুণে সুন্দর। এবং মনোরম। কারণ এই পৃথিবীর মানুষেরা জাহাজে চড়ে অনায়াসেই সমুদ্র পার

হতে পারে। আকাশ-ছোঁয়া পর্বতে উঠতে পারে। এবং সীমাহীন সবুজ বনানীতে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াতে পারে। যে বনানী বা সবুজ প্রান্তরে দৃষ্টি রাখলে, আকাশ-মাটি একাকার বলেই মনে হয়। এমন সব দৃশ্য তাদের অতল সাগরে কল্পনাতীত। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না।

সে এই পার্থিব জগৎ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আগে তার বোনদের করেছে। কিন্তু কেউ ভাল মত জবাব দিতে পারে নি। তার ঠাকু'মা, যিনি এ জগৎ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন, তিনিও অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। একদিন সে তার ঠাকুমা'কে প্রশ্ন করল যে যদি পৃথিবীর মানুষেরা জলে ডুবে না যায় তবে কি তারা তাদের ঐ মাটির পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে? আমরা যেমন সমুদ্রে বাস করেও মারা যায়। তারা কি তেমন মারা যায় না?

রাজমহিষী বললেন: যায়। তারাও আমাদেরই মত মারা যায়। এবং তাদের জীবনের স্থিতিকাল ও আমাদের থেকে স্বল্প। আমরা এখানে তিনশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি। পরে মারা গেলে আমরা ফেনা হয়ে জলের ওপরে ভাসি। মৃত্যুর সময় আমরা আমাদের প্রিয়জন কিম্বা আপনজনদের জন্যে চোখের জল ফেলি না। আমাদের আত্মা ও অমর নয়। আমরা আমাদের দেহ পরিবর্তন করে নতুন জীবনেও প্রবেশ করি না। আমাদের জীবনটা অনেক অংশে সবুজ নলবনের মত। অর্থাৎ আমাদের জীবনের সঙ্গে নলবনের তুলনা করা যেতে পারে। যে বন একবার কেটে ফেললে আর বাড়ে না বা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু অপর দিকে পৃথিবীর মানুষের আত্মা অমর। এমন কি মানুষ মারা গেলেও তাদের আত্মা দীর্ঘ বাতাসের পথ ধরে আকাশে চলে যায় এং উজ্জ্বল তারাদলের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন আমরা মারা গেলে অতল জল ভেদ করে ওপরে উঠে এসে ফেনা হয়ে জলে ভাসি এবং মানুষের বার বার জীবন মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে থাকি। ঠিক তেমনি, মানুষেরাও পার্থিব জগৎ থেকে অন্য এক অজানিত জগতে চলে যায়। যে জগৎ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমরা জীবনে কখনো কোন দিন সে জগতের সন্ধান পাব না। বা দেখবার সুযোগ আশা করতে পারি না।

রাজমহিষীর কথা শুনে ছোট মৎসকুমারী বললো : আমাদের আত্মা অমর কেন নয় ঠাকু'মা। আমি যদি আমার শতবর্ষের আয়ু দান করি, তবে কি একদিনের জন্যেও আমি পৃথিবীর মানুষ হয়ে সেখানে বাস করতে পারি না? সেই পার্থিব জগতের আনন্দ উপভোগ করতে পারি না?

সে কথা শুনে ঠাকু'মা বললেন : তুমি এ কথা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবে না। একটুও চিন্তা করবে না। আমার মনে হয় আমরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সুখী। এবং খুশীও।

: কিন্তু আমি নই ঠাকু'মা। আমি আমার মৃত্যু আশা করবো। এবং কামনা করবো। আমার মৃত্যু হলে আমি ফেনা হয়ে সমুদ্রে আনন্দে ভেসে বেড়াতে পারবো। অসীম সাগরের যে অন্তহীন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তার গান শুনতে পাব। এবং পৃথিবীতে ফুটে থাকা সুন্দর সুন্দর ফুলের শোভা দেখতে পারবো। আর সব শেষে লাল সূর্যের আলো আমার দু'চোখ ভরিয়ে দেবে।

পরে একটু ভেবে ছোট মৎসকন্যা আবার বললো : আচ্ছা ঠাকু'মা! এমনকি কোন কাজ আছে যা' করলে আমি অমর আত্মার অধিকারিনী হতে পারি।

সমুদ্রের রাজমহিষী জবাব দিলেন : না। যতক্ষণ না পৃথিবীর মানুষ, তাদের বাপ-মায়ের চেয়েও তোমাকে আপনজন বলে মনে করবে বা ভালবাসবে, ততক্ষণ এ কাজ সম্ভব হবে না। সে যদি তার সমস্ত মানবিক চিন্তা, ভাবনা এবং ভালবাসা তোমার ওপর ন্যস্ত করে এবং তোমার হাতে তার হাত রেখে বলে যে, সে তোমার প্রতি সারা জীবন বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থাকবে, তাহলে তার অমর আত্মা তোমার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তখন তুমি সেই পার্থিব জগতের আনন্দ অনুভব করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ সে যদি তার আত্মা দ্বিধাহীন ভাবে তোমাকে দান করে তবেই এটা সম্ভব। কিন্তু এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব। এমন ঘটনা কখনোই ঘটতে পারে না। কারণ আমাদের এই মাছের মত ল্যাজ, যেটাকে আমরা আমাদের জীবনে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করি, পৃথিবীর মানুষের কাছে এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এবং বিকলাঙ্গের প্রতীক। তারা আমাদের শরীরের

ল্যাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানতে চায় ও না। কারণ তাদের শরীর অন্য ধাতুতে এবং অন্য ভাবে গড়া। তাঁদের শরীরের শেষ অংশে যে শক্ত দুটি জিনিষ ঝুলতে দেখা যায় তারা তাদের নাম দিয়েছে পা। যে পা দিয়ে তারা রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। এবং তাদের এই পায়ের অংশকেই শরীরের সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করে।

রাজমহিষীর কথা শুনে ছোট মৎসকন্যা চট্ করে তার নিজের ল্যাজটা এক নজরে দেখে নিল।

রাজমহিষী শেষে বললেন: এবারে চল আমরা আনন্দ করি গিয়ে। আমাদের এখানে তিনশো বছর বেঁচে থাকার আনন্দ কিছু কম নয়। তারপর জীবনের শেষ ভাগে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম নেব। অতএব এখন এস। আজকে আমাদের সভাঘরে সকলের নাচের আয়োজন করা হয়েছে।

এই সব সভাগৃহ এমন ভাবে সাজানো হয় এবং সেই সব রাতে এমন আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে যা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। পৃথিবীর মানুষেরা এই সব আনন্দ এবং এই ভাবে ঘর সাজানো কল্পনাই করতে পারে না। এই সব সভাগৃহের দেওয়াল ও ছাদ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাঁচে মোড়া থাকে। শ'য়ে শ'য়ে প্রকাণ্ড আলোর ঝাড় সারা ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যার রং কোনটা ঘন লাল। কোনটা আবার ঘাসের মত সবুজ। সেই আলোর ঝাড় থেকে যে নীল শিখা বেরিয়ে আসে তা' সমস্ত ঘরকে একটা হালকা আলোয় ভরিয়ে দেয়। এবং দেওয়াল ভেদ করে সে স্বচ্ছ আলো সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে আলোকিত করে। কাতারে কাতারে নানা রং-এর বড় এবং ছোট মাছ সে আলোর দেওয়ালের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়।

নাচ ঘরে সেই আলোর বন্যার মধ্যে মৎসকুমার ও কুমারীরা আনন্দে মিষ্টি সুরে গান গায় এবং নাচে। পৃথিবীর মানুষেরা এমন সুকণ্ঠের অধিকারী হতে পারে না। সে দিন নাচ ঘরে ছোট মৎসকন্যাটি এমন সুন্দর গান গাইলো যে উপস্থিত সকল মৎসকুমার ও কুমারীরা তাকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগলো। ছোট মৎসকন্যা ভাল করেই জানে যে তার মত এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ সারা সাগর-রাজ্যে বা মাটির পৃথিবীতে কারো নেই। এ কথা

চিন্তা করবার পর মুহূর্তেই তার মন সেই সাগর-রাজ্য ছাড়িয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটতে লাগলো। তার তখন সেই রাজকুমারের কথা এবং মানুষের অমর আত্মার কথা মনে পড়তে লাগলো। সে তখন আর নাচ ঘরে থাকতে না পেরে, সেই আনন্দ-মুখর নাচ ঘর ছেড়ে নিজের বাগানে একা এবং নিরিবিলি এসে বসলো। সেখানে কিছুক্ষণ পরে সামনের সমুদ্রে এক প্রকার শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবলো এখন নিশ্চয়ই সেই রাজপুত্র জাহাজ ভাসিয়ে তারই মাথার ওপর দিয়ে, চলে যাচ্ছে। যে রাজপুত্র সারাক্ষণ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং যার হাতে নিজেকে অর্পণ করতে পারলেই প্রকৃত সুখ আসবে।

ছোট মৎসকুমারী শেষ বারের মত চিন্তা করলো, আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে জয় করবার চেষ্টা করবো। এবং তার অমর-আত্মার অধিকারিণী হবার আশা করবো। আজকে যখন আমার সমস্ত বোনেরা ঐ নাচ ঘরে ব্যস্ত আছে, তখন আমি এই সুযোগে একবার সাগর-ডাইনীর কাছ থেকে ঘুরে আসি। যে আজীবন আমাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন সে হয়তো সব শুনে আমাকে কিছু একটা উপদেশ দিতে পারে। কিম্বা সাহায্যও করতে পারে।

সাগর-ডাইনীর কথা মনে পড়তেই ছোট মৎসকন্যা তাড়াতাড়ি তার বাগান পথটুকু পার হয়ে ঘুর্ণি-সেতুর দিকে এগুতে লাগলো। এই ঘুর্ণি সেতুর পেছনেই সেই মায়াবিনী বাস করে। ছোট মৎসকন্যা এই পথে জীবনেও আসেনি। এ অঞ্চলে কোন ফুল বা ঘাস জন্মাতে পারে না। চারিদিকে শুধু ধূ-ধূ প্রান্তর বালিতে ঢাকা। এই বালিময় দীর্ঘ পথ পার হয়ে তবে ঐ ঘুর্ণি-সেতুতে আসতে হবে। এবং ঐ বিপজ্জনক সেতু পার হতে পারলে সাগর-ডাইনীর সীমানায় আসা সম্ভব হবে। এই ঘুর্ণি-সেতুর নীচে গভীর খাদ। সেখানে অবিরাম চাকার মত একটানা জলের ঘুর্ণি বইছে। এই ঘুর্ণি এত জোরে প্রবাহিত হচ্ছে যে, এই সীমানায় কোন কিছু এসে পড়লে আর রক্ষা নেই। ঐ খাদের জলের ঘুর্ণি, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টেনে একেবারে গভীরে নিয়ে চলে যাবে। কোন মৎসকুমার বা

কুমারী এর আঁওতায় পড়লে তার মৃত্যু অনিবার্য। ছোট মৎসকন্যা দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো যে এই মারাত্মক এবং বিপজ্জনক পথ পার হয়ে সাগর-ডাইনীর কাছে যেতে হবে। এ ছাড়া সেখানে যাবার আর অন্য কোন পথ নেই। আবার এই বিপদ-সেতু পার হতে পারলেই যে সে বিপদ মুক্ত হবে এমন নয়। এই বিপদ-সেতু পার হবার পর, সাগর-ডাইনীর বাড়ী যাবার পথে একটা ছোট বন পড়বে। সেখানকার গাছগুলো অক্টোপাশের মত। সেই সব গাছের শরীরের অর্দ্ধেক অংশ পশুর মত। আর অর্দ্ধেক অংশ গাছের মত। এরা সমুদ্রের অক্টোপাশের মতই ভয়ঙ্কর। এরা মাটি থেকে অনেকটা ভয়ঙ্কর সাপের মত ওপরে উঠে এসেছে। এদের মাথা প্রায় শতাধিক অংশে ভাগ করা। শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাহুগুলো অত্যন্ত হালকা এবং পাতলা। এদের আঙ্গুল গুলো যে কোন পোকার মত নরম এবং খুশি মত নাড়াচাড়া করতে সক্ষম। এরা যদি কোন কিছু একবার দখলে আনতে পারে, তবে তার আর ফিরে যাবার কোন পথ খোলা নেই। তাকে তাদের হাতে প্রাণ দিতেই হবে। ছোট মৎস-কন্যা অনেক সন্তর্পণে এবং অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঐ ঘুর্ণি-সেতু পার হয়ে সেই বনে ঢুকলো। সে মনে মনে ভাবলো, একটা বিপদ অনেক কষ্টে কাটিয়ে ওঠা গেল। কিন্তু এবারে কি হবে কে জানে। এবারে বিপদ আরো বেশী। আরো মারাত্মক। সে পথ চলতে চলতে এত বেশী ভয় পেল যে, ভয়ে তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যেতে লাগলো। নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগলো। একবার ভাবলো সে আর এগুবে না। ফিরেই যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তার রাজকুমারের কথা মনে পড়ল তখন তার মনে বল সঞ্চার হল। সে আবার সাবধানে পথ চলতে শুরু করলো। ছোট মৎসকন্যা তার এলো চুল ভালো করে বেঁধে নিল। যা'তে সেই ভয়ঙ্করী অক্টোপাশ তার চুল ধরে টেনে নিজের কাছে আনতে না পারে। সে তার হাত দুটো গুটিয়ে বুকের ওপর রাখলো এবং গভীর সাগরে পালিয়ে যাওয়া মাছের মত, এক ঝটিকায় নিজেকে সে পথটুকু পার করে নিয়ে এল। যা'তে সেই দানবী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে না পারে। সে

জানে যে এই দানবীর একশোটা মাথায় হাজারটা হাত আছে। এবং সে হাতের আঙ্গুলগুলো লোহার পাঞ্জার মত শক্ত। পৃথিবীর মানুষ যদি কখনো সাগরে ডুবে যায়, তা'হলে এই সব অক্টোপাশের দল তাদের শরীরের মাংস খেয়ে ফেলে এবং একখানা শাদা কঙ্কালে পরিণত করে। পৃথিবীর পশুর মাংসও এরা পরমানন্দে ভক্ষণ করে। এমনকি সাগরের মৎসকুমার ও কুমারীদেরও এদের হাতে রেহাই নেই। এরা তাদের পেলেও ছাড়বে না। সেইজন্যেই ছোট মৎসকন্যার এ পথে আসতে অত্যধিক ভয়।

নানা কষ্টে এ পথ পার হয়েও তার নিস্তার নেই। এর পর সামনে যে বন দেখা যাচ্ছে সেটা বিষধর সাপের রাজ্য। মোটা মোটা সব নানা জাতের বিষধর সাপ সে বনে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ছোট মৎসকন্যা অত্যন্ত সন্তর্পণে সে বন ওপার হয়ে এল। এবং সামনে একটা বড় শাদা মানুষের হাড়ের বাড়ী দেখতে পেল। যে সব পৃথিবীর মানুষ জলে ডুবেছে তাদের হাড় দিয়ে এ বাড়ী তৈরী। সে দেখলো, সে বাড়ীর দাওয়ায় বসে সেই সাগর-ডাইনী একটা মোটা বিষধর সাপ গালে পুরে মহানন্দে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। তার চোখদুটো বড় বড়। এবং আগুন ঠিকরে পড়ছে।

ছোট মৎসকন্যা গুটি গুটি কাঁপতে কাঁপতে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

সাগর-ডাইনী তাকে দেখেই বললোঃ আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছো। এ কাজ করা তোমার বোকামী হবে। এবং তুমি তোমার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে। তুমি চাইছো তোমার ঐ ল্যাজটা খসে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের মত দুটো পা গজাক। যা'তে তুমি অনায়াসেই হেঁটে সেই রাজপুত্রের কাছে যেতে পার। তুমি ভাবছো এতে তুমি রাজপুত্রের মন জয় করতে পারবে। সে তোমাকে ভালবাসবে। তোমার হাতে সে হাত রাখবে। এবং তুমি পৃথিবীর মানুষের মত অমর আত্মার অধিকারিনী হতে পারবে।

কথা বলতে বলতে সেই সাগর-ডাইনী এত জোরে হেসে উঠলো যে তার মুখ থেকে সেই বিরাট বিষধর সাপটা মাটিতে পড়ে গেল এবং ক্রমাগত কুঁকড়ে যেতে লাগলো।

সাগর-ডাইনী শেষে বললো ঃ যাই হোক, তুমি আমার কাছে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছ। কারণ আগামীকাল সূর্য উদয় হলেই আমি আর তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবো না। তোমাকে আবার একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ছোট মৎসকন্যা এ কথা শুনে অত্যন্ত কাতর চোখে বললো ঃ এখনো সময় আছে। আপনি দয়া করে আমার জন্যে কিছু করুণ।

সাগর-ডাইনী একটু চিন্তা করে বললো ঃ বেশ! আমি তোমার জন্যে একটি পাত্রে তরল পানীয় মিশিয়ে একটা জিনিস তৈরী করে রাখবো। তুমি আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগে সাঁতার দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বসে সেই পানীয়টুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেলবে। তা'হলেই দেখবে যে তোমার ল্যাজ খসে পড়েছে এবং মানুষের মত সুন্দর দুটি পা গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখবে, এই পা নিয়ে যখন তুমি হাঁটবে তখন মনে হবে যে তোমার শরীরে কে যেন অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক ভাবে আঘাত করছে। এবং তোমার শরীরে রক্ত ঝরবে। তবে তোমাকে সেখানে যে-কেউ দেখবে তারা সকলেই বলবে যে তুমি সেই জগতে সকলের চেয়ে সুন্দরী। তোমার চেয়ে সুন্দরী পৃথিবীকে আর কেউ নেই। তোমার শরীরেও অফুরন্ত লাবণ্যের জোয়ার বয়ে যাবে। পৃথিবীর কোন নর্তকী তোমার মত এত সুন্দর এবং হালকা পায়ে হাঁটতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখবে, তোমার প্রতি পদক্ষেপে তুমি অস্ত্রের আঘাতের মত যন্ত্রণা পাবে এবং প্রতি মুহূর্ত নিজের শরীর রক্তাপ্লুত মনে হবে। এখন ভেবে দেখো যে, তুমি এত যন্ত্রণা এবং কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত আছ কিনা। যদি থাক তবে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ছোট মৎসকন্যা ঐ সাগর-ডাইনীর কথা শুনে একটু চুপ করে রইল। তারপর সেই রাজপুত্র ও তার অমর আত্মার কথা চিন্তা করে বললো ঃ আমি প্রস্তুত।

ঃ ভাল করে ভেবে দেখো। সাগর-ডাইনী বলতে লাগলো ঃ যদি তুমি একবার ঐ পৃথিবীর মানুষ হয়ে যেতে পার। মানে আমি বলতে

চাইছি যে, যদি তুমি মানবী দেহ ধারণ করতে একবার সক্ষম হও, তা'হলে কিন্তু আর কখনও মৎসকন্যাতে রূপান্তরিত হতে পারবে না। তুমি আর কখনও অতল জলের গভীরে ফিরে এসে তোমার বোনদের সঙ্গে কিম্বা পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না।

ঃ আমি এতেও রাজী। মৎসকন্যা বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল।

সাগর-ডাইনী বললো ঃ আরো আছে। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। তুমি যদি ঐ রাজপুত্রের অন্তর জয় করতে না পার। অর্থাৎ ঐ রাজপুত্র যদি তার বাবা-মাকে ভুলে এবং সমস্ত কিছু ভুলে, তোমাকে ভাল না বাসে বা তার আত্মা তোমার ওপর ন্যস্ত না করে অথবা সে যদি তার নিজের দেশের পুরোহিতের সামনে তোমাকে বিবাহের জন্যে তার ডান হাত তোমার হাতে না রাখে, তা'হলে তুমি কখনও পৃথিবীর মানুষের মত অমর আত্মার অধিকারিনী হতে পারবে না। এবং তার পরের দিনই আমার অভিশাপে সে অপর কোন কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হবে। তা'তে তোমার মন ভেঙ্গে যাবে এবং তখন তুমি এই বিশাল সমুদ্রে ফেনায় রূপান্তরিত হবে।

ঃ আমার শেষ সিদ্ধান্তে আমি অনড়। ছোট মৎসকন্যাটি যখন এই কথা বললো, তখন তার মুখ-চোখ মৃত্যুর মত শাদা।

ঃ বেশ! তবে তার জন্যে আমার প্রাপ্য আমাকে দিতে হবে। সাগর-ডাইনী বললো ঃ আমি এ ব্যাপারে খুব সামান্য জিনিষে সন্তুষ্ট হব না। আমি জানি তোমার কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্টি। এবং আমার মনে হয় তোমার ঐ কণ্ঠস্বরেই তুমি রাজপুত্রকে বশ করতে পারবে। সুতরাং তোমার ঐ কণ্ঠস্বর আমাকে দান করতে হবে। আমি আমার পাত্রে যে তরল পদার্থ তৈরী করে দেব, তার মূল্যস্বরূপ তোমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ জিনিষ দান করতে হবে। কারণ ঐ তরল পদার্থে আমার শরীরের কিছু রক্ত মেশাতে হবে। এবং ঐ মিশ্রিত রক্তই তোমার চলার পথে রক্ত ঝরাবে। প্রতি পদক্ষেপে মনে হবে যে তোমার শরীরে কে যেন অবিরাম অস্ত্র চালাচ্ছে।

সাগর-ডাইনীর কথা শুনে ছোট মৎসকন্যাটি অত্যন্ত ভীত হয়ে বললো ঃ

কিন্তু আপনি যদি আমার অমূল্য কণ্ঠস্বরই নিয়ে নেন, তবে আমার অবশিষ্ট কি থাকবে?

: তোমার শরীরের সুন্দর গড়ন থাকবে। সাগর-ডাইনী বলে যেতে লাগলো : তোমার সুন্দর পদক্ষেপ থাকবে। তোমার নাচের মত সুন্দর চলন থাকবে। তোমার অমন সুন্দর ভাবে-ভরা চোখ দুটি থাকবে। এতগুলো গুণের তুমি অধিকারিনী হবে। সুতরাং আমার মনে হয় এই সব গুণেই তুমি একজন মানুষের মন অনায়াসেই জয় করতে পারবে। কী পারবে না?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মৎসকন্যা সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছু সময় পরে সাগর-ডাইনী মুখ তুলে বললো : কী হল? মনে ভয় ধরে গেল? যদি না ধরে থাকে তবে আমার কাছে এগিয়ে এস। আমি তোমার জিভ্‌টা কেটে নি। এবং সেই মূল্যবান তরল পদার্থ তৈরীর আয়োজন করি।

: আমি রাজী। মেয়েটি ধীরে ধীরে বললো।

সাগর-ডাইনী তখন হাসি মুখে মেয়েটির জিভ্‌ কেটে নিয়ে সেই তরল পদার্থ তৈরীর কাজ শুরু করলো। সে তার সামনে বেঁধে রাখা একটা প্রকাণ্ড মোটা সাপকে সেই গরম জলে সিদ্ধ করতে লাগলো। তাতে নিজের বুকের কাল রক্ত ভাল করে মেশালো। সেই তরল পদার্থ তৈরী করবার সময় তার বাষ্প এমন এক ভীতিবহ আকার ধারন করলো যে তা' দেখে কেউ ভয় না পেয়ে পারে না। মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে ঐ সব দেখে অত্যন্ত ভয় পেতে লাগলো। ডাইনী শেষে সেই গরম জলে আরো অনেক কিছু মেশালো। তারপর তৈরী শেষ হলে, তখন সেই তরল পদার্থ একেবারে ঝর্ণার জলের মতো দেখতে লাগলো।

সাগর-ডাইনী সেই তরল পদার্থ তৈরী শেষ করে বললো : এ নাও।

মৎসকন্যার জিভ্‌ আগেই ডাইনী কেটে নিয়েছে। সেইজন্যে সে এখন কথা বলতে অক্ষম। সে এখন থেকে আর কথাও বলতে পারবে না। গানও গাইতে পারবে না।

সাগর-ডাইনী বললো : ফিরে যাবার সময় যদি আবার বনের অক্টো-

পাশগুলো তোমাকে ধরতে আসে, তবে তুমি এই তরল পদার্থের কিছুটা ওদের গায়ে ছিটিয়ে দেবে। তা'হলে তখনই ওদের হাত-পা গুলো হাজার ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে খসে পড়ে যাবে।

কিন্তু সাগর-ডাইনীর এই উপদেশের কোন দরকার ছিল না। মৎস-কন্যাটি যখন রাতের আঁধারে একটি পাত্রে ঐ তরল পদার্থ হাতে নিয়ে গভীর বন পার হয়ে আসছিল, তখন ঐ পাত্রটি তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছিল। এবং তারই ভয়ে অক্টোপাশগুলো সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। সে তাড়াতাড়ি ঐ বন পার হয়ে ঝুলন্ত সাঁকোর পথ ধরলো।

সে হাঁটতে হাঁটতে তার পিতার রাজপ্রাসাদের সামনে এল। কিন্তু ভেতরে ঢুকলো না। নাচঘরে তখনো নাচ চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই নাচ শেষ হবে। এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়বে। সে ভেতরে যেতে সাহস পেল না। কারণ সে এখন বোবা। কথা বলতে পারবে না। সে কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। কান্নায় তার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। সে জানে যে শেষ বারের মত, সে তার বাবা এবং বোনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর কোন দিন এখানে ফিরে আসবে না। এঁদের সঙ্গে দেখা হবে না। সে তার চোখের জল মুছলো। তারপর ধীরে ধীরে তার বোনদের ফুলের বাগানে এসে দাঁড়ালো। এবং প্রতিটি বাগান থেকে একটি করে ফুল তুলে নিজের হাতে নিল। সে বাগানের প্রতিটি ফুলগাছকে বিদায় জানালো। রাজপ্রাসাদকে বিদায় জানালো। এবং শেষে সমুদ্রের অতল আহ্বানে সাড়া দিল।

সূর্য ওঠার আগেই সে সাঁতার দিয়ে সেই রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদের সামনে চলে এল এবং নদীর গায়ে-লাগা সুন্দর মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে এসে বসলো। সূর্য তখনো ওঠে নি। শেষ রাতের চাঁদ উজ্জ্বল আকাশে আলো ছড়াচ্ছে। শান্ত নদীতে চাঁদের আলোর বন্যা। মৎসকন্যা সেখানে বসে সেই তরল পদার্থটি ধীরে ধীরে পান করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, কে যেন তার সমস্ত শরীরটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে। সে শরীরে অসম্ভব জ্বালা অনুভব করতে লাগলো। তার

মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এবং এক কঠিন শীতল মৃত্যু তাকে ঘিরে ধরছে।

সূর্য আকাশে উঠে আসবার অনেক পরে তার আবার জ্ঞান ফিরে এল। সে তাকিয়ে দেখলো যে সেই রাজপুত্র তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার বড় বড় এবং ভ্রমর কালো চোখে মৎসকন্যাকে দেখছে। মৎসকন্যা সেটা অনুভব করেই, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো এবং দেখলো যে তার শরীরের ল্যাজটা কখন খসে পড়েছে এবং তার বদলে সুন্দর দুটি শাদা পা শরীরে শোভা পাচ্ছে। যে পা দুটির জন্যে তার এত সাধনা। আজকে সে তা' পেল। মৎসকন্যা উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জা পেল। কারণ তার পরনে কোন কাপড় ছিল না। সে তার লম্বা লম্বা চুল দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর ঢেকে দাঁড়ালো। রাজপুত্র তাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো যে সে কে? কোথা থেকে আসছে? তখন মৎসকন্যাটি কোন কথা না বলে অত্যন্ত কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কারণ সে কথা বলতে অক্ষম। রাজপুত্র তখন তার হাত ধরে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। যাবার সময় মৎসকন্যার প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হতে লাগলো যে, কে যেন তার শরীরে ছুরির ফলা বসিয়ে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সে কাতর হতে লাগলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে, সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে রাজপুত্রের হাত ধরে অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গিতে পথ চলতে লাগলো। যাতে সকলেই তার চলার ভঙ্গিটি দেখে ভাল বলে এবং ভালবাসে।

তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল। অত্যন্ত দামী এবং সুন্দর সুন্দর পোষাক পরানো হল। তার ফলে তাকে রাজপ্রাসাদের সমস্ত মেয়েদের থেকে বেশী সুন্দরী দেখাতে লাগলো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে সে বোবা। ফলে সে গান গাইতে কিম্বা কথা বলতে পারলো না। রাজপুত্র তার প্রাসাদের দরবার কক্ষে নিজের সিংহাসনে বসে। সেই প্রাসাদের অত্যন্ত সুন্দরী সব মেয়েরা সুন্দর সুন্দর সব পোষাক পরে রাজপুত্রের সামনে নাচতে লাগলো। এবং চমৎকার গলায় গান শোনাতে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন এত সুন্দর গান গাইলো যে রাজপুত্র আনন্দে হাতে তালি দিয়ে উঠলো। তা'

দেখে মৎসকন্যাটি মর্ম বেদনায় মরে যেতে লাগলো। এবং ভয়ানক ভাবে দুঃখ পেল। কারণ সে জানে যে এই মেয়েটির চেয়ে তার গলা আরো মিষ্টি। আরো সুন্দর সে গান গাইতে পারে। তার পিতার সাগরপ্রাসাদে সে অনেক বার নাচে এবং গানে সকলকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এখন কোন উপায় নেই। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো : আমার কপাল মন্দ। সেইজন্যে আমি রাজপুত্রকে আমার গান শোনাতে পারলাম না। কারণ চিরদিনের মত আমার গানের গলা আমি মহাকালের কাছে দান করেছি।

দীর্ঘ সময় গান শোনাবার পর সেই সব মেয়েরা অদ্ভুত সব বাজনার সঙ্গে রাজপুত্রকে নানা ধরণের নাচ দেখাতে লাগলো। তাদের নাচের ছন্দে যেন লাবণ্য ঝরে পড়তে লাগলো। মৎসকন্যা দেখলো যে রাজপুত্র অত্যন্ত খুশি মনে নাচ দেখছে। তখন সে আর থাকতে না পেরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো এবং সেই নাচ ঘরে নিজের শরীরটাকে এমন ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে নাচ শুরু করলো যে এ যাবৎ এমন নাচ কেউ দেখাতে পারে নি। সে তার প্রতিটি নৃত্য ভঙ্গিমায় নতুন নতুন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে লাগলো। এবং সুন্দর আবেদন ভরা চোখে রাজপুত্রের দিকে চাইতে লাগলো। যে আবেদন আগের মেয়েরা অনেকক্ষণ নেচেও আনতে পারে নি। সে বুঝলো যে, সে রাজপুত্রের মন এমন ভাবে ভরিয়ে দিতে পেরেছে যা' আগের কোন মেয়ে পারে নি। তার নাচ আজ সত্যিই সার্থক।

রাজপুত্র আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে এমন নাচ তিনি জীবনে দেখেন নি। কিন্তু সাগর-ডাইনীর সে অভিশাপ যাবে কোথায়? সেইজন্যে মৎসকন্যার প্রতিটি নাচের পদক্ষেপে মনে হতে লাগলো যে তার সমস্ত শরীরে, বিশেষ করে দুটি পায়ে, কে যেন ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। সে সাগর-ডাইনীর অভিশাপে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। কিন্তু যন্ত্রণা নিয়েও সে যা' নাচলো তা' অনবদ্য। এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রাজপুত্র তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে মৎসকন্যার নাচ দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি। এমন নাচ এর আগে এই প্রাসাদে কেউ দেখাতে পারে নি। আজকের মত তাকে ছুটি দেওয়া

হল। সে এখন বিশ্রাম নিতে পারে। এমন কি আজ রাতে মৎসকন্যা ইচ্ছে করলে তাঁর শোবার ঘরের দরজার সামনে মখমলের বিছানায় আরাম করে নিদ্রা দিতেও পারে।

পরের দিন সকালে রাজপুত্র মৎসকন্যাকে পুরুষের পোষাক পরবার হুকুম দিলেন। যা'তে কেউ তাকে চিনতে না পারে এবং তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারে। মৎসকন্যা রাজপুত্রের হুকুম অনুসারে নিজেকে সেই পোষাকেই সজ্জিত করলো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্রের সঙ্গে বেড়াতে বেরুল। তারা অনেক বন পার হল। শেষে এমন বনে প্রবেশ করলো যে, সে বনের সমস্ত গাছ-গাছালী তাদের ঘিরে ধরতে লাগলো। সমস্ত গাছের ডাল তাদের মাথায় এসে ঠেক্‌তে লাগলো। এবং এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ বলে মনে হতে লাগলো। কিন্তু তবুও তারা চলতে লাগলো। সেই বনে নানা পাখীদের কূজন শোনা যেতে লাগলো। ঠাণ্ডা বাতাস তাদের শরীর জুড়িয়ে দিতে লাগলো। এত দীর্ঘ পথ চলার জন্যে এবং সাগর-ডাইনীর অভিশাপের জন্যে তার ছ'পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো যে তার ছ'পা দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। কিন্তু তবু সে হাসিমুখে এবং নিজের অসীম যন্ত্রনা ভুলে রাজপুত্রের সঙ্গে সেই বন পার হয়ে এক পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়াল। সেখানে তাদের মাথার ঠিক ওপরেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, পাখীদের ডানা মেলে উড়ে যাবার মত, উড়ে চলে যাচ্ছে। এবং পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা এক ফালি সবুজ ক্ষেত চোখে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। মৎসকন্যা সেখানে রাজপুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগলে। সে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল।

সেইদিনই রাত্রে, যখন রাজপ্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে, তখন মৎসকন্যা হঠাৎ তার পায়ের ব্যথা খুব বেশী অনুভব করতে লাগলো। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে, রাজপ্রাসাদের যে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি সাগরে এসে মিশেছে, তার শেষ ধাপে পা রেখে বসলো। এবং পা ছুটোতে ঠাণ্ডা জল লাগাতে লাগলো। যা'তে পায়ের অসম্ভব জ্বালা কিছুটা কমে। যা লাঘব হয়। সে পায়ে জল লাগাতে লাগাতে তার বাবা এবং

বোনদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। সাগরের অতল তলে রাজপ্রাসাদে ঠিক এই মুহূর্তে তারা কি করছে, তার জানতে ভারী ইচ্ছে হতে লাগলো। সে ঐ উত্তাল তরঙ্গ তোলা সাগরের জলে একভাবে তাকিয়ে রইলো।

এই ভাবে প্রায় রাত্রেই মৎসকন্যা তার পায়ের জ্বালা কমাবার জন্যে ঐ সাগর-পাড়ে জলে পা ডুবিয়ে বসতে লাগলো। একদিন অনেক রাতে সে বসে আছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। কোন সাড়া নেই। শুধু দূরে দূরে শাল-পাইনের মর্মর ধ্বনি কানে ভেসে আসছে। আর ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটা জুড়িয়ে দিচ্ছে। সে আপন মনে নিজের খেয়ালে তার বোনদের কথা ভাবতে লাগলো। ক্রমে রাত গভীর হতে লাগলো।

এক সময় সে দেখলো তার বোনেরা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে অতল জল থেকে উঠে এসে সাগরের ওপরে হালকা ভাবে সাঁতার দিয়ে বিষাদের গান গাইছে। এবং তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মৎসকন্যা অবাক হল। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে তার খোঁজে তার বোনরা এতদূর চলে আসবে। সেই সময়ে তার দারুণ কথা বলবার ইচ্ছে হতে লাগলো। তাদের ডাকতে ইচ্ছে করতে লাগলো। কিন্তু উপায়হীন। তার কথা বলবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। সে বাধ্য হয়ে হাত ইশারায় তাদের কাছে আসতে বললো। তারা ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়ে দিয়ে তাদের ছোট্ট বোনটির কাছে এগিয়ে এল। এবং তাকে চিন্‌তে পেরে আনন্দিত হল। তারা জানতে চাইলো যে, সে এখন কেমন আছে। পৃথিবীর রাজপুত্র এবং মানুষদের তার ভাল লাগছে কিনা। এবং তাদের মন জয় করতে পেরেছে কিনা। ছোট মৎসকন্যা হাত ইশারায় জবাব দিয়ে বললো: পেরেছে। শেষে তারা তাদের ছোট্ট বোনটিকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

সেদিনের ঘটনার পর তার বোনেরা প্রায়ই এসে দেখা দিতে লাগলো। নানা খবর নিতে লাগলো। একদিন ছোট মৎসকন্যাটি দেখলো যে তার ঠাকুমা'ও ভেসে এসেছেন। তাকে দেখবার জন্যে। তবে তিনি একেবারে কাছে আসতে পারেন নি। অনেকখানি দূরে রয়েছেন। তিনি অনেক বছর সাগরে আসেন না। সেইজন্যে কাছে আসতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁর

পাশে মাথায় মুকুট পরে তার বাবাও রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য বোনদের মত কাছে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছেন না।

এই ভাবে দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। রাজপুত্র ঐ মৎসকন্যাটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কিন্তু তাকে রাজরাণী করবার কথা তিনি কখনো কল্পনা করেন নি। অথচ ঐ ছোট মৎসকন্যাটি যদি এ জগতের রাজরাণী হতে না পারে, তবে সাগর-ডাইনীর অভিশাপ অনুসারে সে আর কোনদিন অতল জলে তার নিজের প্রাসাদে ফিরে যেতে পারবে না। সে অমর আত্মার ও অধিকারিনী হতে পারবে না। রাজপুত্র যেদিন তাকে ছেড়ে অন্য রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন, সেইদিনই তাকে সমুদ্রের ফেনায় পরিবর্তিত হয়ে সাগরে ভেসে বেড়াতে হবে। সে এই সব অভিশাপের কথা জেনেই এখানে এসেছে। এবং যদি সে সফলকাম হতে না পারে, তবে তার জীবনের পরিণতি কোথায় সেটাও তার জানা আছে।

একদিন যখন রাজপুত্র মৎসকন্যার কপাল চুম্বন করলেন, তখন মৎস-কন্যা তার করুণ চোখদুটো এমন ভাবে রাজপুত্রের চোখে রাখলো যে সে যেন প্রশ্ন করছেঃ আপনি কি আমাকে আপনার রাজপ্রাসাদের সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন ?

রাজপুত্র বললেনঃ হ্যাঁ! ভালবাসি। তুমি আমার একমাত্র প্রিয় পাত্রী। তার কারণ আমি তোমার সঙ্গে একজনের খুব বেশী মিল খুঁজে পাই। যা'কে আমি জীবনে মাত্র একবারই দেখেছি। আর দ্বিতীয় বার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

রাজপুত্র কথা বলতে বলতে একটু চুপ করলেন। মৎসকন্যা তার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। তিনি আপন মনে বলে যেতে লাগলেনঃ আমি একদিন একটি জাহাজে ফিরছিলাম। সমুদ্রে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ উথাল-পাথাল হয়ে আমাদের জাহাজে আছড়ে পড়তে লাগলো। জাহাজে আমরা অনেকেই ছিলাম। আমরা আমাদের এবং জাহাজটাকে নানা ভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই হল না। জাহাজ ডুবতে লাগলো।

এবং আমিও ডুবলাম। শেষে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় একটা গীর্জার সমতটে এনে আছড়ে ফেললো। আমি তখন অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ মেলে দেখি সেই গীর্জার কুমারী কন্যারা আমাকে বাঁচিয়ে তোলবার ও প্রাণে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করছে। আমি তাদের পাশে একটি ছোট্ট মেয়েকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। এবং শুনেছিলাম যে, সেই মেয়েটির জন্যেই আমার জীবন সেই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে। মেয়েটিকে আমি মাত্র দু'বার দেখেছি। এই পৃথিবীতে আমি যদি সত্যিই কাউকে ভালবেসে থাকি তবে সেই মেয়েটিকে। যে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখছি যে তুমি দেখতে একেবারে সেই মেয়েটির মত। তোমার চেহারার সঙ্গে তার অত্যন্ত মিল রয়েছে। তোমাকে দেখে তাকে আমার মনে এলেও তার প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে তোমাকে আমার মনে স্থান দিতে কোন অসুবিধা নেই। আমার যতদূর মনে হয় সেই মেয়েটি ঐ দেশের গীর্জার কোন সেবিকা হবে। এবং আমার কপাল ভাল যে তার প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে ভগবান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাদের কখনো কোনদিনও বিচ্ছেদ হতে পারে না।

রাজপুত্রের সব কথা শুনে সেই ছোট মৎসকন্যাটি মনে মনে ভাবতে লাগলো: হায়! রাজপুত্র কোনদিনও জানতে পারবে না যে আমিই সেদিন তার জীবন রক্ষা করেছিলাম। আমিই তাকে সেদিন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ পার করে সেই গীর্জার সমতটে এনে হাজির করেছিলাম। এবং সেখানে তাকে শুইয়ে দিয়ে সমুদ্রের ফেনারাশির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দেখছিলাম যে কোন পৃথিবীর মানুষ তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে কিনা। এবং আমি দেখেছিলাম যে একদল কুমারী কন্যা ঐ গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে সেবা-যত্ন করতে শুরু করেছিল। রাজপুত্র ভাবছেন, যে মেয়েটি তার জীবন রক্ষা করেছে, সেই মেয়েটি ঐ দলের একজন। কিন্তু তা' নয়। সেই মেয়েটি যে আমি, এ কথা কি করে তাকে এখন বোঝাবো। মৎসকন্যার চোখে জল এল। সে রাজপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগলো। মৎসকন্যা শেষে

ভাবলো : সেই মেয়েটি জীবনেও আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়াবে না। সুতরাং আমি যখন তাঁর পাশে ফিরে আসতে পেরেছি, তখন আমি নিজে প্রতিদিন তাঁকে নিজের হাতে সেবা করবো। দেখাশোনা করবো। তাঁর প্রতি যত্ন নেব। তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসবো। এবং তাঁর জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করবো। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

মৎসকন্যা প্রতিজ্ঞা করলো বটে কিন্তু অলক্ষ্যে ভগবান হাসলেন। মৎসকন্যা জানে না যে অলক্ষ্যে তার কপালে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। পুব আকাশে মেঘ জমা হচ্ছে।

কিছুদিন পরেই রাজপুত্রের বিবাহের জন্যে নানা দেশ-বিদেশ থেকে খবর আসতে লাগলো। নানা রাজ্যের রাজাদের সুন্দরী কন্যাদের দেখা হতে লাগলো। শেষে একদিন রাজপুত্র ঠিক করলেন যে, তাঁরই পাশের রাজ্যের রাজার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আছে। তিনি তাঁকে দেখতে যাবেন।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পাত্র, মিত্র, অমাত্য সকলেই রাজপুত্রের সঙ্গে যাবে। সেইজন্যে নানা বেশ-ভূষায় তারা সাজতে লাগলো। আর জাহাজটাকে ভাল করে সাজাতে লাগলো। তারপর একদিন শুভদিন দেখে জাহাজ ছাড়ল। রাজপুত্র মৎসকন্যাকেও সঙ্গে নিলেন। তাঁর সেবার জন্যে অনেক দাসীও সে জাহাজে নেওয়া হল। জাহাজ চলতে লাগলো। এক সময় রাজপুত্র মৎসকন্যাকে বললেন : প্রতিবেশী রাজ্যের কন্যাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু পিতা-মাতার একান্ত অনুরোধে যেতে হচ্ছে। তবে তাঁরা জোর করে এ বিবাহে মত দিতে কখনোই বলবেন না। আর তা' ছাড়া আমি ঐ রাজকন্যাকে ভালবাসতেও পারি না। কারণ আমাকে যে মেয়েটি বাঁচিয়েছিল, এ রাজকন্যা কখনোই তার মত দেখতে হতে পারে না। তার মত দেখতে এ জগতে একটি মাত্রই কন্যা আছে, সে তুমি। সুতরাং আমাকে যদি বিবাহে কোনদিন মত দিতে হয় তবে তোমাকে বিবাহের জন্যেই মত দিতে হবে। এই কথা বলতে বলতে তিনি মৎসকন্যার

অধর চুম্বন করলেন। তার কোঁকড়ান কালো চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। এবং মৎসকন্যার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলেন।

রাজপুত্রের কথা শুনে মৎসকন্যার সমস্ত মন আশায় ভরে উঠতে লাগলো। সে ভাবতে লাগলো, তার জীবনেও অমর আত্মার অধিকারিনী হবার সুযোগ আসবে।

মৎসকন্যার কোলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর রাজপুত্র বললেন ঃ তুমি সমুদ্রকে ভয় পাও না।

রাজপুত্রের কথা শুনে মৎসকন্যা শুধুমাত্র একটু হাসলো! সে বোবা। কথা বলতে পারে না। সেইজন্যে সে রাজপুত্রের কথা শুনে মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলো, সমুদ্রের অতল তলে কী রহস্য লুকোনো আছে, সে ছাড়া আর কেউ জানে না। জানা সম্ভবও নয়। কিন্তু তবুও নিয়তির পরিহাসে তাকে আজ নীরব থাকতে হচ্ছে।

একদিন অনেক রাতে মৎসকন্যা জাহাজের ডেকে একা একা দাঁড়িয়ে। জাহাজের সকলেই তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী হয় কে জানে। এর শেষ কোথায়? এর পরিণতি কোথায় তার জানা নেই। সে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই ভাবছিল। গভীর রাতের চাঁদ আকাশে হামা দিয়ে দিয়ে উঠে আসছিল। অঢেল জ্যোছনা ছড়ানো। সমুদ্রের জল জ্যোছনার আলোয় পুরু একখানা চাদরের মত ওঠা-নামা করছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। মৎসকন্যা এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে। এমন সময় সে পরিষ্কার ভাবে তার পিতার প্রাসাদে ঠাকু'মাকে মুকুট মাথায় দেখতে পেল। তিনি দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছেন। মৎসকন্যার জাহাজটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঢেউয়ের দোলায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। মৎসকন্যা এক ভাবে জলে তাকিয়ে থাকলো। ভাবলো যদি আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। একটু পরে তার চিন্তাই ঠিক হল। দূরে সমুদ্রে তার এক বোনকে দেখতে পাওয়া গেল। সে সাঁতরে এদিকেই আসছিল। মৎসকন্যা তাকে দেখতে পেয়ে হাসলো এবং

ইশারায় এগিয়ে আসতে বললো। কিন্তু হঠাৎ কেবিনের ছেলেটি এপাশে এসে পড়তে মৎসকন্যার বোনটি টুক্ করে ডুবে গেল।

জাহাজের ছেলেটি প্রথমে একটু অবাক হল। সে মৎসকন্যার দিকে তাকাল। মৎসকন্যা তাকে বোঝালো যে সে ভুল দেখেছে। যে জিনিষটা এদিকে এগিয়ে আসছিল সেটা সাগরের পঞ্জীভূত রাশি রাশি শাদা ফেনা। একত্রিত ভাবে এদিকে এগিয়ে আসছিল বলেই তার এই ভ্রম। এবং এটা স্বাভাবিক। জাহাজের ছেলেটি সে কথার কোন জবাব দিল না। সে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

পরের দিন সকালে জাহাজ প্রতিবেশীর বন্দরে এসে নোঙর করল। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যে আনন্দ-ঘন্টা ও শাঁখ বেজে উঠলো। সৈনিকরা তাদের পতাকা হাতে যুদ্ধের বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসতে লাগল রাজপুত্রকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে।

বেশ কয়েকটা দিন সে রাজ্যে আনন্দ-উৎসব লেগে রইল। প্রতিদিন নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া আর নানা জলসায় রাজপুত্রের মন ভরিয়ে রাখা হতে লাগলো। শোনা গেল যে, রাজপুত্র যে রাজকন্যাকে দেখতে এসেছেন তিনি তখন সে রাজ্যের বাইরে। তিনি সে দেশের পাহাড়ের সব চেয়ে এক গীর্জায় গেছেন রাজকীয় আদব-কায়দা শিখতে। পরে একদিন তিনি ফিরে এলেন।

মৎসকন্যা রাজকুমারীকে দেখবার জন্যে খুবই ব্যাকুল ছিল। রাজকুমারী দেখতে কেমন? তার চেয়েও সুন্দরী কিনা। এই সব নানা প্রশ্ন তার মাথায় দিনরাত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কারণ সে জানে যে, যদি এ দেশের রাজপুত্র তাকে বাদ দিয়ে ঐ দেশের রাজকন্যাকে গ্রহণ করে তবে তার মৃত্যু-দিন ঘনিয়ে আসবে। এবং তাকে সাগরের ফেনায় পরিণত হয়ে আজীবন ভেসে বেড়াতে হবে। এমন কি নিজের বাবার কাছেও আর ফিরতে পারবে না। এ অভিশাপ সাগর-ডাইনীর দেওয়া। এবং এ অভিশাপ মাথায় নিয়েই সে এই পৃথিবীতে এসেছে।

রাজকুমারী গীর্জা থেকে ফিরে এসেছে শুনে মৎসকন্যা নিজেও তাকে

দেখা পাবার আশায় সতর্ক রইলো। পরে একদিন শুনলো যে আজ সন্ধ্যায় এ দেশের রাজকুমারী নাচ ঘরে রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে নাচ ঘরে বাজনা বেজে উঠলো। হাজার বাতির আলো সেই নাচ ঘরে স্রোতের বন্যা বইতে লাগলো। রাজকুমারীর সখীবৃন্দ নাচে গানে রাজকুমারের মন ভরিয়ে দিতে লাগলো। রাজকুমারকে আমোদে রাখতে লাগলো। রাজকুমার খুব খুশি। দেখে মনে হতে লাগলো যে তিনি এমন খুশি আগে কখনো হননি। মৎসকন্যা মনে মনে দুঃখ পেতে লাগলো। কিন্তু এখানে তার করণীয় কিছু নেই। সে নাচ ঘরে 'চুপচাপ এক কোণে রাজকুমারীর আশায় বসে রইল।

এমন সময় খবর এল রাজকুমারী আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে কামান গর্জে উঠলো। শাঁখ বেজে উঠলো। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। বাজনা আরো দ্রুত বাজতে লাগলো। নাচ গানের গতি বাড়লো। রাজপুত্র সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকালেন। মৎসকন্যাও ঘামতে শুরু করলো। তার মনে হল, সে কেমন যেন এক মানসিক দুর্বলতা অনুভব করছে। এবারে সে হয় তো রূপের প্রতিযোগীতায় পরাজিত হতে পারে।

ঘরে ঢুকলো রাজকুমারী। পাত্‌লা এক সবুজ সিল্কের ওড়নায় নিজেকে মুড়ে রেখেছে। সুন্দর মুখশ্রী। পাকাসোনা গায়ের রং। অত্যন্ত মসৃণ এবং স্বচ্ছ। কালো কোঁকড়ানো মেঘ বরণ চুল। টানা ভ্রুর নীচে গভীর কালো দুটি চোখ।

রাজকুমারী ধীর পায়ে রাজপুত্রের দিকে এগিয়ে এল। রাজপুত্র মুগ্ধ। তিনি কাছে এসে বললেন : আজকে চিনতে পারলাম যে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমি যখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তীরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, তখন তুমি তোমার আন্তরিক সেবায় আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে আমি ভুলতে পারি নি। পারা সম্ভব নয়। আজ আমি পরিপূর্ণ সুখী।

রাজপুত্র রাজকুমারীর কাছে এসে আবেগ চোখে তাকালেন। রাজকুমারী একটু মৃদু হেসে রাজপুত্রকে মাল্যদান করলেন। চারিদিকে অজস্র শাঁখ

বেজে উঠলো। উলুধ্বনি পড়তে লাগলো। তোরণে তোরণে সানাই বেজে উঠলো। সখীবৃন্দের আজ আনন্দ আর ধরে না। রাজকুমারীকে রাজপুত্র বরণ করে নিয়েছেন। তারা আরো দ্রুত লয়ে নাচতে লাগলো।

চারিদিকে যখন আনন্দ-উৎসবের জোয়ার বইতে লাগলো, তখন মৎস-কন্যার দু'চোখ কান্নায় ভরে গেল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তার মনটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো। সে ভাবলো, রাজপুত্রের বিবাহের দিনটি হবে তার মৃত্যুর দিন। সে আর মানবী থাকবে না। সাগর-ডাইনীর অভিশাপে সমুদ্রের ফেনা রাশিতে রূপান্তরিত হবে। এবং সারা জীবন ঐ ফেনা হয়ে সাগরে সাগরে ভেসে বেড়াতে হবে। এ অব্যর্থ অভিশাপ। এ তাকে বহন করতেই হবে।

সারা নাচ ঘরে আনন্দের বন্যা। কিন্তু মৎসকন্যার দু'চোখ ছাপিয়ে জলের জোয়ার।

সমস্ত গীর্জায় ঘন্টা বেজে উঠলো। শহরের সমস্ত রাস্তা-ঘাট আলোকিত করা হল। ঢেড়া পিটিয়ে রাজকুমারীর বিবাহ-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা হল। ঘরে ঘরে রূপোর পাত্রে সুগন্ধী তেলের আলো জ্বালানো হল। নানা গীর্জার পুরোহিতেরা ধীরে ধীরে ঐ নাচ ঘরে জমায়েত হয়ে মন্ত্র পাঠে রাজপুত্র ও রাজকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন করলেন। বর-কনে দু'হাত জোড় করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন। নানা আনন্দ-উৎসব আর জলসায় সারাটা দিন বয়ে গেল। সেইদিন সেই রাজ্যে কেউ দুঃখী ছিল না। একমাত্র মৎসকুমারী ছাড়া। তার একমাত্র চিন্তা যে তার মৃত্যুদিন এগিয়ে আসছে। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তাকে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে। যে পৃথিবীকে ভালবেসে, যে পৃথিবীর মানুষকে ভালবেসে, সে সুখী হতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল। যার জন্যে এত অভিশাপ মাথায় নিয়েও সে এখানে এসেছিল। কিন্তু কিছুই হল না। তাকে যেতেই হবে।

ঠিক হল সেই রাত্রেই বর-কনে যাত্রা করবে। ফুলে ফুলে জাহাজ সাজান হল। বার বার কামানে তাদের যাত্রা ঘোষণা করা হতে লাগলো।

নানা বর্ণের পতাকা জাহাজে তোলা হল। বাতাসে সেগুলো পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো। জাহাজে বর-কনেকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে মুক্তো বসানো দামী দামী কার্পেট পাতা হতে লাগলো। বাজনাদারেরা বাজনা বাজাতে লাগলো। সখীবৃন্দ সেই জাহাজে নাচতে লাগলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে বর-কনে সেই জাহাজে এসে রাজসিংহাসনে বসলেন।

জাহাজ চলতে শুরু করল। হালকা হাওয়ায় জাহাজটা দুলতে দুলতে গভীর সাগরের দিকে ভেসে যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে রাত গভীর হল। জাহাজের বাতি গুলো সব জ্বেলে দেওয়া হল। নাবিকেরা তখনও আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

মৎসকন্যা জাহাজের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলো। তার প্রথম দিনের কথা মনে পড়তে লাগলো। যেদিন জাহাজে ঝড় উঠেছিল। যেদিন জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। এবং সে নিজের জীবন বিপন্ন করে এই রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছিল। সে আকাশে তাকালো। আজকেও ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। কিন্তু ঝড় কি উঠবে?

মৎসকন্যাকে নাচের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো হল। মৎসকন্যা জীবন-মরণ পণ করে নাচ শুরু করল। এমন আবেদনপূর্ণ নাচ সে আগে কখনো নাচে নি। রাজহাঁস সাগরে যেমন ভেসে বেড়ায়, ঠিক তেমন করে সে সারা জাহাজে নাচের আসরে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এই নাচের সময় তার মনে হতে লাগলো যে, কে যেন তার সমস্ত পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করছে। তার দু'পায়ে রক্ত ঝরছে। সাগর-ডাইনীর কাছ থেকে সে এই অভিশাপ নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল। ভেবেছিল রাজপুত্রের মন জয় করে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সে অমর আত্মার অধিকারিনী হতে পারবে। কিন্তু সবই আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। তার জীবনে আজ রাতই শেষ নাচ। আজকের রাতটাই শেষ রাত। তারপর মৃত্যুতে বিলীন।

অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়েও সে সমস্ত জাহাজে নেচে বেড়াতে লাগলো। কারণ এ যন্ত্রণার চেয়েও আজ তার মানসিক যন্ত্রণা অনেক বেশী। অনেক

হৃদয় বিদারক। সে জানে আজ রাতেই রাজপুত্রের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ। যার জন্যে সে তার বাবার রাজপ্রাসাদ এবং বোনদের ত্যাগ করেছিল। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরকে দান করেছিল। এবং প্রতিদিন নাচের সময় পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। এবং এখনো করছে। কিন্তু তখন সে কল্পনাও করতে পারে নি যে, শেষে তার ফল এই দাঁড়াবে। মৎসকন্যার চোখে আবার নতুন করে জল আসতে লাগলো।

গভীর রাত পর্যন্ত এই ভাবে নাচ চলতে লাগলো। পরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে সকলে থামলো। রাজপুত্র রাজকুমারীর হাত ধরে কেবিনে বিশ্রাম নিতে গেলেন। সকলে যে যার কেবিনে চলে গেল।

মৎসকন্যা একা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। এবং এক সময় ফুরিয়ে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে লাগলো। সে জানে সূর্যের আলো ফুটলেই সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। শীতল মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করবে। সে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকালো। এবং নিজের বোনদের সেখানে ভাসতে দেখতে পেল। সে দেখলো, তাদের মুখও তারই মত পাংশুটে ও বিবর্ণ। তারাও আজ অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের সুন্দর কালো চুল বাতাসে উড়ছে না। সেগুলো তারা কেটে ফেলেছে।

মৎসকন্যা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালো। তারা কাছে এসে বললো: আমরা আমাদের সুন্দর চুল কেটে সাগর-ডাইনীকে উপহার দিয়েছি। তার কাছে আমাদের একটি মাত্র অনুরোধ, সে যেন আজকে রাতটা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে। সে আমাদের চুলের পরিবর্তে একটা ধারাল ছুরি দিয়েছে। তোমাকে দেবার জন্যে। সাগর-ডাইনীর উপদেশ হচ্ছে, তুমি সূর্য্য ওটার আগেই এই ছুরি রাজপুত্রের বুকে আমূল বিদ্ধ করবে। তার তাজা এবং গরম রক্ত তুমি দু'পায়ে ভাল করে মাখবে। তা'হলে তোমার দু'পা তৎক্ষণাৎ খসে পড়বে এবং তোমার শরীরে আবার আগের মত সুন্দর একটি মাছের ল্যাজ গজাবে। তুমি আবার মৎসকন্যাতে রূপান্তরিত হতে পারবে। আমাদের মধ্যে ফিরে এসে আবার তিনশো বছর বাঁচতে পারবে।

তা'না করলে, তুমি সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। এবং পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় পরিণত হবে। তোমার জীবনে এ অভিশাপ। কাজেই তুমি যদি বাঁচতে চাও তবে আর দেরী কোরো না। সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে নতুবা রাজপুত্রকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমাদের মত ঠা'কুমাও তার সমস্ত শাদা চুল ঐ ডাইনী-বুড়ীকে অর্পন করেছে। শুধু মাত্র তোমাকে ফিরে পাবার জন্যে। দেরী কোরো না। চুপ করে বসে থেকো না। আমাদের হাত থেকে এই ছুরিটা নাও। দেখছো না পূবের আকাশ লাল। আর একটু পরেই সূর্য উঠবে। এবং তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে। নাও ছুরিটা ধরো।

মৎসকন্যার বোনেরা তার হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিয়ে সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল। কেউ দেখতে পেল না। কেউ জানতেও পারলো না যে কি ঘটে গেল।

মৎসকন্যা ছুরি হাতে ধীর পায়ে রাজপুত্রের কেবিনে প্রবেশ করলো। দেখলো রাজকন্যার বুকে মাথা রেখে রাজপুত্র অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে নীচু হয়ে রাজপুত্রের কপালে একটি সুন্দর চুম্বন রেখা এঁকে দিল। তারপর আকাশে তাকালো। যেখানে সূর্যের আলো ফুটে উঠছে। আর একটু পরেই সারা পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়বে। মৎসকন্যা একটু অন্যমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতের ছুরিটার দিকে তাকালো। তারপর আবার দৃষ্টি ফেরালো রাজপুত্রের দিকে। তখন রাজপুত্র ঘুমের ঘোরে আপন মনেই রাজকন্যার নাম ধরে ডাকছিল। মৎসকন্যা তার হাতের ছুরিটা শক্ত করে ধরেও কেমন যেন দাঁড়িয়ে গেল। রাজপুত্রের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাত আল্‌গা হয়ে আসতে লাগলো। দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ধীর পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ছুরিটা জলে ফেলে দিল। এবং নিজে ডেক থেকে সাগরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তার কপালে যা' লিখন ছিল তা' ঘটতে লাগলো। সে ধীরে ধীরে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা রাশিতে রূপান্তরিত হতে লাগলো।

সমুদ্রের বুক বেয়ে বেয়ে সূর্য আকাশে উঠে এল। এবং তার আলো সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল। মৎসকন্যা মৃত্যুর যন্ত্রণা একটুও অনুভব করলো না। সে সূর্যের আলোতে ধীরে ধীরে ফেনা রাশিকে রূপান্তরিত হয়ে ভাসতে ভাসতে জাহাজের কাছে চলে আসতে লাগলো। আবার পর মুহূর্তে বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে চলে যেতে লাগলো। সে, সূর্যের আলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। পৃথিবীর নানা প্রাণী ও পাখীদের গান শুনতে লাগলো। তাদের ভাষা বুঝতে লাগলো। তাদের ভাষা ও গান যে এত মিষ্টি, সে কথা আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি। কারণ পৃথিবীর মানুষ কোন দিনও এদের কথা, ভাষা বা গান বুঝতে পারে না। সে নিজেও কোন দিন পারে নি। কিন্তু এখন পারে। এখন তাদের ভাব, ভাষা ও গানের মর্ম ও অর্থ তার কাছে পরিষ্কার। মৎসকন্যা দেখলো যে, সে বাতাসের কথা বুঝতে পারছে। এবং তার শরীরটা পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা থেকে শুকিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মৎসকন্যা বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো ঃ এ আমি কোথায় যাচ্ছি ? তার গলার স্বর তার নিজের কাছেই এত সুমিষ্ট মনে হতে লাগলো যে পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গেই এর কোন তুলনা চলে না।

বাতাস-কন্যারা বললো ঃ মৎসকন্যার আত্মা তখনই অমর হতে পারে যদি পৃথিবীর কোন মানুষ তাকে গ্রহণ করে। ভালবেসে কাছে টেনে নেয়। তবে। সুতরাং মৎসকন্যাদের অমরত্ব নির্ভর করছে অপরের ইচ্ছার ওপর। অপরে ইচ্ছা না করলে এ কাজ সম্ভব হয় না। কিন্তু বাতাস-কন্যারা, যদিও তারা অমর নয়, তবুও তাদের সৎ ও মহৎ কাজের জন্যে এক হিসাবে অমর বলা যায়। আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারি। ঠাণ্ডা দেশ থেকে যে কোন সময়ে গরম দেশে গিয়ে সে দেশ শীতল করতে পারি। এবং পৃথিবীর অনেক মানুষকে অনেক শিশুকে গরমের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। আমরা দেশে দেশে ফুলের গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারি। গন্ধ ছড়াতে পারি। মানুষের ক্লান্ত মন ও দেহকে তাজা করে তুলতে পারি। এই ভাবে আমরা তিনশো বছরেরও

বেশী পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে পারি। এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে, তাদের শরীর শীতল করে, অমরত্ব লাভ করতে পারি। শোনো মৎসকন্যা! তুমি সারাটা জীবন পরিশ্রম করেছ। সুতরাং আগামী তিনশো বছর পরে, তুমি আমাদের মতই অমরত্ব লাভ করবে বলে আমরা আশা করি।

মৎসকন্যা সে কথা শুনে তার জলে ভরা চোখ দুটো তুলে উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকাল। সমুদ্রে জাহাজটা তখনো এগিয়ে যাচ্ছে। মৎসকন্যা দেখলো, রাজপুত্র ও রাজকন্যা মুক্তোর মত দেখতে সমুদ্রের ফেনারাশির দিকে তাকিয়ে আছে। যে ফেনারাশি ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ঐ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওরা জানে না যে মৎসকন্যা আর সমুদ্রের সেই ফেনারাশির সঙ্গে মিশে নেই। সে এখন প্রকৃতির বাতাস হয়ে বাতাস-কন্যাদের সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মৎসকন্যা তখন বাতাস হয়ে ঐ জাহাজে চলে গেল এবং রাজকন্যার সুন্দর কপালে একটি মিষ্টি চুম্বন রেখা এঁকে দিয়ে রাজপুত্রের গায়ে শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিতে লাগলো। তারা কিন্তু মৎসকন্যার এই সব কাজের কথা কিছুই জানতে পারলো না। পরে মৎসকন্যা তার বাতাস-বোনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে রক্তিম মেঘের আড়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর সমস্ত বাতাস-বোনদের ডেকে এনে জাহাজের পালে বাতাস লাগিয়ে লাগিয়ে রাজপুত্রের যাত্রাপথকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। যাতে রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার নিজের রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারে। রাজপুত্রের কষ্ট কমাবার জন্যেই মৎসকন্যার এই প্রচেষ্টা।

মৎসকন্যা জাহাজের পালে হাওয়া লাগাতে লাগাতে বাতাস কন্যাদের বললো: আমরা এই ভাবে মানুষের সেবা করতে করতে তিনশো বছর পরে একদিন নিশ্চয় স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে যাব।

মৎসকন্যার কথা শুনে বাতাস-কন্যাদের একজন বললো: আমরা তার আগেও পৌঁছে যেতে পারি। কারণ আমরা অদৃশ্য বাতাস হয়ে প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে চলে যাব। সেখানে হয়তো কোন সুন্দর

শিশুকে দেখতে পাব। যে শিশু তার পিতামাতার ভালবাসার পাত্র এবং গর্ব্বের বস্তু। আমরা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেব। তার ক্লান্ত শরীরে আমাদের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে তার ক্লান্তি দূর করে দেব। তার শরীর জুড়িয়ে দেব। সে তখন আনন্দে নেচে উঠবে। আমাদের সঙ্গে খেলা করবে। আমরা যদি তার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন এবং আমাদের তিনশো বছর সময়ের নিশ্চয়ই কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেবেন। তা'তে আমাদের স্বর্গরাজ্যে পেঁাছাবার সময় এগিয়ে আসবে। ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু আমরা যদি কোন বাড়ীতে দুষ্টু ছেলেব সাক্ষাৎ পাই এবং তাকে কোন প্রকারেও শান্ত করতে না পারি তখন স্বভাবতঃই আমাদের চোখ জলে ভরে উঠবে। আমরা আমাদের কাজে ব্যর্থ হব। এবং তা'তে আমাদের প্রতিটি বিন্দু চোখের জল, আমাদের চলার পথকে আরো পিচ্ছিল করবে। দীর্ঘায়িত করবে। এবং আমাদের শিক্ষা গ্রহণের সময় আরো বৃদ্ধি পাবে। স্বর্গে পেঁাছাবার দিন আরো পিছিয়ে যাবে। ফলে আমাদের বাতাস হয়ে আরো দীর্ঘদিন মানুয়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

জুলভার্ণ

[ফরাসী দেশে ন্যাঁটে নামক জায়গায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী জুলভার্ণের জন্ম হয়। তিনি প্রথম পড়াশোনা করেন ন্যাঁটেতে। তারপরে যান প্যারিসে। প্যারিসে তিনি গিয়াছিলেন আইন পড়তে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক রহস্যমূলক গল্প-উপন্যাস লেখার একটা নেশা তাঁর বরাবরই ছিল। এবং প্যারিসে পড়তে গিয়ে সেটা আরো বেড়ে যাবার ফলে, তিনি আইন পড়া আর শেষ করতে পারেন নি। তখন তিনি আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে, পুরোপুরি ভাবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং রহস্যমূলক গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী প্রথম সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ফাইভ উইকস্ ইন-এ বেলুন প্রকাশ লাভ করে। এটাই তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস। এরপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "জার্ণি টু দি সেন্টার অফ্ দি আর্থ" প্রকাশিত হয়। এই বইটি প্রকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে জুলভার্ণের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। এরপর তিনি আরো অনেক বই লেখেন। তার মধ্যে "ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন", "এ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন্ এইটি ডেজ", "টুয়েনটি থ্যাউজ্যাণ্ড লিগস্ আণ্ডার দি সী" ও "দি মিষ্টিরিয়াস্ অ্যায়ল্যাণ্ড" বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই জুলভার্ণের বই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প উপন্যাস লেখার কাজে সম্ভবতঃ জুলভার্ণই প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হল অদ্ভুত গল্প বলার ভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ জুলভার্ণের মৃত্যু হয়। কিন্তু আজো তিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।]

কাকা বললেনঃ আমার কথা শোনো। বর্তমানে জলের সমস্যাই আমাদের বড় সমস্যা। পূব দিকে এগিয়ে কোন ফল হবে না। ও পথ লাভা, কয়লা আর পাথরে ভরা। আমার মনে হয়, আমরা পশ্চিম দিকের সুড়ঙ্গ-পথ ধরে এগুলে বেশী লাভবান হব। কারণ এ পথটা গ্রানাইট্ পাথরের এবং সোজাসুজি পৃথিবীর ভেতরে চলে গেছে। আমার মন বলছে,

এ পথে নিশ্চয়ই আমরা জলের উৎসের সন্ধান পাবো। এই মুহূর্তে তোমরা একবার কলম্বাসের কথা মনে কর। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে তিনি তাঁর বিদ্রোহী নাবিকদের কাছে তিন দিনের সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি চাইছি মাত্র একটি দিন। এই একটি দিনের শেষে যদি আমরা জলের উৎসের কোন সন্ধান করতে না পারি তবে আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে আমরা পৃথিবীর ওপরে ফিরে যাব।

কাকার প্রতিজ্ঞার ধরণ দেখে আমার মন নরম হল। আমি শত বিরক্তিতেও রাজি হয়ে বললাম: তবে তাই হোক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমাদের ভাগ্য ফেরে তবে যাত্রা করা যাক।

আমরা পশ্চিম দিকের সুড়ঙ্গ-পথ ধরে এগুতে লাগলাম। হ্যান্স বরাবরের মত এবারেও আগে আগে যেতে লাগলো। একশো গজের মত আমরা এগিয়ে এসেছি। কাকা দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে আসতে আসতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন: এ জায়গার পাথর দেখে মনে হচ্ছে সামনেই কোন জলের উৎস আছে। আমরা ঠিক পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছি। চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক।

আমরা এগুতে লাগলাম। পথে যেতে যেতে কাকা পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন। আমরা শুনতে লাগলাম। তিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে নানা জাতীয় পাথর এবং তার গুণাগুণ সম্বন্ধেও বলতে লাগলেন। আমরা চলতি পথে সে সব কথা শুনছি। এই ভাবে রাত আটটা বেজে গেল। জলের সন্ধান তখনো কিছু পাওয়া গেল না। আমরা পাথরের বদ্ধ দেওয়ালে আট্‌কা পড়ে রইলাম। কাকাকে দেখে মনে হল যে তিনি প্রতি মুহূর্তে জলের আশা করছেন। ভাবছেন, এখনই কোন জলের ঝর্ণনার শব্দ শুনতে পাবেন।

কিন্তু সবে আশাই বৃথা হয়ে যেতে লাগলো। আমার প্রতি মুহূর্তে জল পাবার আশায় এগিয়েই যেতে লাগলাম। আমরা এই ভাবে আরো অনেক পথ এগিয়ে গেলাম। আমার পা দুটো অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। চলার ক্ষমতা কমে আসতে লাগলো। এবং শেষে আমি আর এক পা'ও

এগুতে না পেরে, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কাকার শেষ কথা আমার কানে গেল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন ঃ সব শেষ হয়ে গেল।

আমি অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়েছি জানি না। যখন আমার অল্প অল্প জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখলাম, আমারই কিছুটা দূরে আমার কাকা এবং হ্যানস্ অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। আমি বুঝতে পারলাম না যে ওঁরা কি বিশ্রাম নিচ্ছেন? ঘুমোচ্ছেন? না, আমারই মত জ্ঞান হারিয়েছেন।

আমার শরীরে তখন অসম্ভব ব্যথা। নড়তে পারছি না। কাকার শেষ কথাগুলো মনে পড়ল ঃ সব শেষ হয়ে গেল। হয়তো তাই।

আমি হিসাব করে দেখলাম, পৃথিবীর ওপর থেকে প্রায় চার মাইল মাটির ভেতরে বর্তমানে আমরা রয়েছি। এখান থেকে মাটির ওপরে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করা বাতুলতা। অর্থাৎ এখানে যদি আমরা জল না পাই তবে মৃত্যু অনিবার্য। এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ খোলা নেই।

ওঁরা ওদিকে অসাড় হয়ে পড়ে। আমি এখানে শুয়ে নানাকথা চিন্তা করতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগলো এই বদ্ধ দেওয়ালের পাথরের বড় বড় চাঁই আমার মাথায় এসে পড়বে। এবং আমার মৃত্যু ঘটবে।

এইভাবে আরো কয়েক ঘন্টা কাটলো। এখন চারিদিকে একটা থমথমে ভাব ছড়িয়ে আছে। একটা প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেন আমরা প্রত্যেকে কবরভূমিতে শুয়ে আছি। এর মাঝে আমি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, হ্যান্স টর্চ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে কাকাকে ডাকতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুলো না। আমার স্বর আমার গলাতেই রয়ে গেল। আমি অসহায় ভাবে হ্যান্সের দিকে তাকালাম। ভাবলাম, ও কি আমাদের ছেড়ে চলে গেল? কিন্তু এটা কি সম্ভব? এত দীর্ঘ পথ আমরা একসঙ্গে পেরিয়ে এসেছি। হ্যান্স বরাবরই আগে আগে এসেছে। এত দীর্ঘ পথে ওর সততার যে পরিচয়

আমরা পেয়েছি, তা'তে অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তবুও মানুষের মানসিক পরিবর্তনের কথা বলা যায় না।

হ্যান্সকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা তোলপাড় করতে লাগলো। কাকা ওপাশে অসাড় শুয়ে। হয়তো বা ঘুমিয়ে। আমি আমার মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু মন মানতে চায় না। শেষে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম যে, হ্যান্স হয়তো জলের উৎস সন্ধানেও যেতে পারে। ও হয়তো আশেপাশে কোথাও জল খুঁজতে গেছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হ্যান্সের দেখা নেই। কাকাও শুয়ে। আমি দু' একবার ওঠবার চেষ্টা করেও পারছি না। অবস্থা যখন এমন, তখন একটা টর্চের আলো সামনে এসে পড়লো। দেখলাম হ্যান্স্ ফিরে আসছে। সে ফিরে এসে কাকার সামনে এগিয়ে গেল এবং তাঁর কাঁধে হাত রেখে নিজের ভাষায় কি যেন বলতে লাগলো। আমি শুনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

কাকাকে হঠাৎ উঠে বসতে দেখলাম। তিনি উঠে বসে চিৎকার করে বলে উঠলেন : জল ? নীচের দিকে ? তা'হলে আর দেরী না করে এখুনি যাওয়া যাক।

জলের কথা শুনে আমি শরীরে বল ফিরে পেতে লাগলাম। ভাবলাম যদি পাওয়া যায়। আমি কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে চলতে লাগলাম।

জলের আশায় আশায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তবু জলের দেখা নেই। তবে পাথরের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে একটা জলের ধারার শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগলো। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, পাথরের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে একটা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় বা কোনদিকে সেটা অনুমান করা সম্ভব হল না। আমি কাকার দিকে তাকালাম। কাকা বললেন : এটা জলেরই শব্দ। এবং শব্দটা আমরা পরিষ্কার শুনতেও পাচ্ছি। আমাদের চারিদিকে গ্রানাইট পাথরের যে

দেওয়াল আছে তার ভেতর দিয়ে নিশ্চয়ই একটা নদী বা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি।

কাকার কথা শুনে আমার মনে হাজার গুণ বল ফিরে এলো। জল ধারার শব্দটাও এখন বেশ পরিষ্কার আসতে লাগলো। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এতক্ষণ জলের শব্দটা আমাদের মাথার ওপরের দেওয়াল থেকে আসছিলো। এবারে সে শব্দ ঘুরে গেল বাঁদিকের দেওয়ালে। আমরা জলের শব্দ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম।

আরো আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটলো। কিন্তু জলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উপরন্তু জলের শব্দটা ক্রমে মৃদু হয়ে যেতে লাগলো। আমাদের মনে হল আমরা জলের উৎস থেকে অন্য পথে চলে যাচ্ছি। দিক নির্ণয়ে আমাদের ভুল হচ্ছে। কিন্তু যাবার পথ আমাদের সামনে মাত্র একটাই।

কী করা যাবে। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। তারপর আবার কিছু পথ পিছিয়ে এসে, দেওয়ালে কান রেখে জলের শব্দ পরীক্ষা করতে লাগলাম। হ্যানস্ দেওয়ালে কান রেখে শব্দ পরীক্ষা করতে করতে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। সে জায়গাটা মাটি থেকে মাত্র তিনফুট উঁচুতে। সে অনেক্ষণ সেখানে কান পেতে থেকে বললো ঃ জলের শব্দটা এই জায়গাতে সব চেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে। হ্যানস্ একটু চিন্তা করে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। তারপর কুড়ুল দিয়ে ঐ দেওয়ালে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলো। কাকা বললেন ঃ মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু এ ভাবে পারা সম্ভব হবে কিনা।

আমি ভাবলাম এ ভাবে দেওয়ালে গর্ত করতে যাওয়াতে বিপদ আছে। পাথরে বড়বড় চাঁই মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু তখন আমাদের জলের প্রয়োজনটাই সব চেয়ে বড়। কাজেই ও সব কথা চিন্তা না করে আমরা কাজে লেগে গেলাম।

হ্যানস্ প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা ঐ গ্রানাইট্ পাথরের দেওয়ালে আঘাতের পর আঘাত করে যেতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সকলকে

অবাক করে দিয়ে একটা তীব্র জলধারা দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে অপর দেওয়ালে আঘাত করলো। জলের গতিতে হ্যানস্ নিজেকে সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল এবং চিৎকার করে উঠলো।

আমরা ভাবলাম জলের তীব্রগতিতে সে আঘাত পেয়েছে। কিন্তু জলে হাত দিয়ে বুঝলাম যে ব্যাপারটা সত্য নয়। সে জল এত গরম যেন ফুটছে। কাকা বললেন ঃ ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এ জল এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমাদের চলার পথ ধরেই সে জলের ধারা এগিয়ে যেতে লাগলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমরা প্রাণ ভরে সে জল পান করলাম। জলের আরেক নাম যে জীবন, সেদিন সেকথা আমরা আবার নতুন করে অনুভব করলাম। সে জল পান করে আমরা যে কি তৃপ্তি পেলাম, তা' সামান্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই জলের অভাবেই তিলে তিলে আমাদের মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছিলো। আমরা আঁজলা ভরে আকণ্ঠ পান করলাম। কাকা বললেন ঃ এ জলে প্রচুর লোহা আছে। হজমের পক্ষে এমন উপকারী আর কিছু হতে পারে না। আমরা 'স্পা' বা 'টোয়েপলিজ'—এর মত বিখ্যাত কোন স্বাস্থ্যকর জায়গার দিকেই অভিযান চালিয়েছি বলেই আমার মনে হয়।

আমরা জল পান করে শরীরে ও মনে বল ফিরে পেলাম। আমি কাকাকে বললাম ঃ এই জলের ধারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সুতরাং এর একটা নাম রাখলে ভাল হয়।

কাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ খুব ভাল কথা। তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি। হ্যানস্ এই জলের ধারা আবিষ্কার করেছে। সুতরাং ওর নাম অনুসারে আমি এর নাম দিচ্ছি 'হ্যানস্‌ব্যাক'।

আমাদের মধ্যে যখন এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তখন এই জলধারা আবিষ্কারের কর্তা হ্যানস্ কোন কথা বললো না। সে আগের মতই নির্বাক হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি বললাম ঃ এই জলধারাকে আমরা এ ভাবে নষ্ট করতে পারি না।

কাকা বললেন ঃ তা'হলে তুমি কি করতে চাও।

আমি বললাম ঃ আমরা আমাদের জলের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নি। তারপর গর্তটা ভাল করে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দি। যা'তে জল নষ্ট হতে না পারে।

কাকা বললেন ঃ বেশ ! তাই করো।

আমরা আমাদের জলের পাত্রগুলো ভাল করে পূর্ণ করে নিলাম। তারপর পাথর দিয়ে সে গর্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সম্ভব হল না। সে জলধারার বেগ এত তীব্র যে তাকে আট্‌কাবার চেষ্টা বার বার বৃথা হতে লাগলো।

কাকা তা' দেখে বললেন ঃ শোনো ! আমরা এই জলধারাকে কেন বন্ধ করবার চেষ্টা করছি। আমাদের জলের পাত্র যখন শূণ্য হবে তখন আবার কোথায় আমরা জল পাব। আমাদের সামনের চলার পথে জল পাবার নিশ্চয়তা কোথায় ?

আমি বললাম ঃ না ! সে নিশ্চয়তা অবশ্য কোথাও নেই।

কাকা বললেন ঃ তা'হলে ? কাজেই ঐ ধারা যেমন বয়ে আসছে আসুক। বন্ধ করবার দরকার নেই। এই জলধারা আমাদের চলার পথেই বয়ে যাবে। সুতরাং এতে সুবিধা হবে দু'টো। আমাদের পথ দেখাবে আবার জলও দেবে। আমরা আবার পরিশ্রান্ত হলে তেষ্টা মেটাতে পারবো।

আমি কাকার কথা শুনে আনন্দে বলে উঠলাম ঃ উত্তম প্রস্তাব। এই পরিকল্পনা খুবই ভাল। যে জলধারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার পথ আমরা রুদ্ধ করতে পারি না।

কাকা হাসতে হাসতে বললেন ঃ তা'হলে তোমরা আমার প্রস্তাব মেনে নিলে ?

আমি বললাম ঃ স্বানন্দে।

কাকা বললেন ঃ এখন এসো আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নি। তারপর যাত্রা শুরু করবো। এখন যে অনেকরাত সেটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ক্রোনোমিটার দেখে বুঝলাম। এবারে আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা কাকার নির্দ্দেশে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

হ্যারিয়েট বীচার স্টোঈ

[হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোঈ ক্রীতদাস প্রথার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একটি উপন্যাস লেখেন। নাম 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'।

সুদূর অতীতে রোমান সাম্রাজ্যের কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল ক্রীতদাস প্রথা। তারপর বহুদিন পরে নব্যযুগের শ্বেতাঙ্গ সভ্য মানুষেরা আবার নতুন করে দাস প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগালের আধুনিক জীবন যাপন ও অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অলিখিত ইতিহাস হচ্ছে, শত সহস্র নিগ্রো ক্রীতদাসের রক্ত স্রোত। যে শ্বেতাঙ্গরা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে সমস্ত সভ্য জগতকে চমক লাগিয়েছে, যে শ্বেতাঙ্গরা সভ্যজগতের সম্ভাবনাকে এগিয়ে দিয়েছে, তাদেরই জীবনের লজ্জাজনক অধ্যায় ক্রীতদাস প্রথার পুনঃপ্রবর্তন।

আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গরা নতুন উপনিবেশ পত্তন করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চল তুলো চাষের পক্ষে খুব উপোযোগী ছিল। এবং এই তুলো চাষের জন্যে তখন দরকার হয়ে পড়েছিল, অসংখ্য শ্রমিক মানুষের। যারা বিনা পারিশ্রমিকে কেনা গোলামের মত আজীবন শ্রমদান করে, আমেরিকার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলবে। সুতরাং তখনই খোঁজ পড়লো আফ্রিকার অসহায় নিগ্রোদের। কিন্তু তারা ডাকলেই আসবে না। সেইজন্যে আফ্রিকার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দিয়ে তাদের খাঁচায় পুরে, সাগর পার করে আনা হল, তুলো চাষের শ্রমিক হিসাবে। যারা বিনা পারিশ্রমিকে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে নীরবে কাজ করে যাবে। কোন প্রতিবাদ করবে না। অসংখ্য নিগ্রোদের ধরে আনা হল, এই কাজের জন্যে। এবং তাদের ওপর দৈহিক নিপীড়ন করে আমৃত্যু শ্রম আদায় করে, ওরা নিজেদের ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গড়ে তুলতে লাগলো। আইনের চোখে এই অকথ্য অত্যাচারকে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হয়নি। কারণ এই নিগ্রোদের কোন প্রকার অনুভূতিশীল মানুষ বলে মনে করা হ'ত না। তাদের মনে করা হ'ত পণ্য সামগ্রী। বেচা-কেনার বাজারে তাদের পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ্যে দর-দামে বেচা-কেনা হ'ত। এবং মানুষ খেয়াল-খুশি মত তাদের কিনে নিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মত খাটাতো। মনুষ্যত্বের এই কলঙ্কের নাম 'ক্রীতদাস প্রথা'। বা দাস প্রথা।

অথচ সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার ভাবে বলা ছিল যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি। এবং ভগবান সকল মানুষকে সমান ভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এখানে সকলের অধিকার সমান। মানুষ এখানে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করবে। নির্বিঘ্নে সামাজিক জীবন যাপন করবে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করবে। এ কথা শাসনতন্ত্রে ঘোষণা সত্ত্বেও তখন সেখানে নির্বিবাদে দাস প্রথা চালু ছিল।

এই ভাবেই সময় এগিয়ে যাচ্ছিলো। তারপর ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গ মনীষীর নজর পড়লো এই দাস প্রথার দিকে। এই অমানুষিক অত্যাচারের দিকে। তখন তাঁরা এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই সময় হ্যারিয়েট বীচার স্টৌঈ এই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ স্বরূপ 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' উপন্যাসটি লেখেন। তিনিটি এই উপন্যাসে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের ছবি এঁকেছেন। এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার বাস্তবরূপ সমস্ত জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। শেষে সমবেত আন্দোলনের ফলে নতুন আইনের বিধানে একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রীতদাস প্রথা বিদায় নিল। দাস প্রথা নিবারণের মূলে যে মহাপুরুষটি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি আব্রাহম লিঙ্কন্। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে এই পাপ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন।

এ জগতে কিছু কিছু চিন্তা ছড়িয়ে আছে, যা মানুষের অতীতের সমস্ত চিন্তা ধারা এবং সভ্যতাকে নাড়া দিয়ে নতুন ভাবে গড়বার সূচনা করে। হ্যারিয়েট বীচার স্টৌঈ-র 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' এই ধরনের একটি অবিস্মরণীয় কলঙ্ক মোচনের ইতিহাস। দাস প্রথা উঠে যাবার পেছনে এই বইয়ের প্রভাব অপরিসীম। একটি দলিল ও বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশে মানবতা যেখানে বিঘ্নিত, মানুষ যেখানে নির্যাতিত, নিপীড়িত, হ্যারিয়েট বীচার স্টৌঈ-র এই বই 'আঙ্কল টমস কেবিন' সেখানে মানবতায় সোচ্চার। মনুষ্যত্বের হাতিয়ার স্বরূপ।]

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টৌঈ | *টম কাকা চলে গেলেন*

অনেক রাত। টম কাকার কুটিরে টম এবং তাঁর স্ত্রী ক্লো জেগে আছেন। কারো চোখেই ঘুম নেই। রাতের প্রহর এগিয়ে চলেছে। টম সারারাত ধরে একটানা বাইবেল পাঠ করলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। আর ক্লো'র শুধু কান্না। অঝোর কান্নায় তিনি সে ঘর ভরিয়ে দিতে লাগলেন। টমের মনুষ্যত্ববোধ ছিল চড়াসুরে বাঁধা। তিনি সে মনুষ্যত্ববোধকে বিক্রি করতে কোন দিনও রাজী নন। সেইজন্যে তিনি

সারারাত ধরে নিজেকে তৈরী করলেন, তাঁর আগামীদিনের ভবিষ্যত এবং নির্মম ভাগ্যকে মেনে নেবার জন্যে। ভোর হলেই যে শাস্তি তাঁকে মাথা পেতে নিতে হবে, যে অজানা পথে তাঁকে রওনা হতে হবে, তার সব কিছুই তাঁর জানা ছিল।

সকালবেলায় ক্লো কাঁদতে কাঁদতে চা তৈরী করে টমকে দিলেন। তখন টমকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘিরে আছে। টম চা খেতে খেতে বললেন : তোমার হাতে এই আমার শেষ চা খাওয়া।

ক্লো কোন জবাব না দিয়ে আরেক বার কেঁদে উঠলেন। এবং বললেন : আমি জানি। দাস ব্যবসায়ীরা তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

টম হেসে বললেন : বলো তো কোথায় ?

ক্লো বললেন : তোমাদের তুলোর বাগানের মালিকের কাছে বেচে দেবে। এবং তুলোর বাগানে যারা কাজ করতে যায়, তারা আর ফেরে না।

টম শান্ত গলায় বললেন : তুমি ভুলে যেও না যে, এখানে আমি যে ভগবানের আশ্রয়ে আছি, সেই ভগবান আমায় তুলোর বাগানেও দেখবেন। তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এবং আমি জানি যে আমি সব সময় তাঁর আশ্রয়েই আছি। তুমি আমার জন্যে একটুও চিন্তা কোরো না।

ক্লো নতজানু হয়ে তাঁর স্বামীর মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

এমন সময় টম কাকার কেবিনের দরজা ভাঙ্গার আওয়াজ এলো। কে যেন সজোরে দরজায় লাথি মারছে। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। এবং দেখা গেল যে বিখ্যাত দাস-ব্যবসায়ী হেলী সে দরজায় দাঁড়িয়ে।

হেলী তার হাতের চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলতে লাগলো : আরে ব্যাটা টম। এখনো চুপ করে ঘরে বসে রয়েছিস্। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় বলছি। নইলে চাবুক চালাবো।

টম এ ঘটনার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

ক্লো শেষ বারের মত কেঁদে উঠলেন।

টম বাইরে এসেই দেখলেন শেল্‌বী দাঁড়িয়ে। তাঁর আগের মনিব। যিনি তাঁর আর্থিক দেনা মেটাবার জন্যে হেলীর কাছে অনেক টাকায় টমকে বেচেছেন। আজকে শেল্‌বীর চোখেও জল। তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে টমকে বললেন : একমাত্র ভগবানই জানেন, আমি কেন তোমাকে আজ বেচে দিলাম। তবে আমি ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করব। আমার হাতে টাকা এলেই আমি যথাযথ ব্যবস্থা নেব তুমি জানবে।

টম চুপ করে থাকলেন। আরেকটু এগিয়েই দেখলেন জর্জ দাঁড়িয়ে। তার চোখেও জল। এই জর্জকে তিনি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। জর্জ কাঁদতে কাঁদতে বললো : টম কাকা। তুমি কিছু ভেবো না। তোমাকে আমরা আবার এখানে ফিরিয়ে আনবো।

টম এবারেও কোন কথা বললেন না। তিনি শেল্‌বী, মিসেস শেল্‌বী ও জর্জকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

হেলী চীৎকার করে বললো : আমি আর সময় দিতে পারিনা। এবারে এগিয়ে না এলে পিঠে চাবুক পড়বে। আমাকে এখুনি এলিজা ও জিমের পেছনে ছুটতে হবে। হেলী তার লোকজনকে বললো : নাও! এবারে লোকটাকে শেকল দিয়ে বাঁধো।

মিসেস শেল্‌বী সে কথা শুনে ছুটে এসে বললেন : আপনি দয়া করে ওঁকে শেকল দিয়ে বাঁধবেন না। উনি জীবনে কখনো শেকল পরেন নি। পালিয়ে যাবার মত মনোবৃত্তি ওঁনার নেই।

হেলী বললো : ব্যাটা কালা আদমী। ওদের বিশ্বাস নেই। হেলী টমকে শেকলে বাঁধলো। এবং নিজের গাড়ীতে তুললো। টম নির্ব্বিকার। যেন ধ্যানে বসে আছেন।

হেলীর লোকজন টমকে নিয়ে চলে গেল। হেলী অন্য একটি গাড়ী করে এলিজা ও জিমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। শেকল পরা অবস্থায় টম গাড়ীতে নির্বিকার বসে রইলো। তাঁর ধ্যান-মৌনী মুখ দেখে রাস্তার সকলেই চোখের জল ফেলতে লাগলো। সকলেই কেঁদে আকুল হতে লাগলো এবং নিজেদের ভাগ্যের কথা ভেবে চিন্তিত হতে লাগলো।

টমের গাড়ী সামনের একটা রাস্তা বাঁক নিয়ে সকলের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেলীর আস্তানায় টমকে নিয়ে আসা হল। এবং একটি অত্যন্ত অপরিষ্কার, আলো-বাতাসহীন খোঁয়াড়ে রাখা হল। সেখানে আরো অনেক ক্রীতদাস জমা হয়ে আছে। এবং অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। হেলী এদের সস্তায় কিনে এনেছে। বাজারে চড়াদামে বেচবার জন্যে।

টম সারাদিন ঐ খোঁয়াড়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। এক ফোঁটা জল বা একটু রুটি কেউ দিল না। তখন তাঁর স্ত্রী ক্লো'র সেবা-যত্নের কথা মনে হতে লাগলো এবং চোখে জল আসতে লাগলো। মিসেস শেল্বী ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। তিনি অনেক কষ্টে সে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাতের দিকে একজন লোক খোঁয়াড়ে এসে প্রত্যেককে এক টুকরো রুটি এবং জল দিয়ে গেল। সকলে তাই খেয়ে শুয়ে পড়লো। এখানে করবার কিছুই নেই। টম কিছুই খেলেন না। তিনি বসে বসে ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগলেন যে হে ভগবান তুমি আমার মনে বল দাও। ওরা আমার দেহকে ক্রীতদাসের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু আমার মন যেন ক্রীতদাস না হয়ে পড়ে। টম চোখ বুঁজে ধ্যান করতে লাগলেন। খোঁয়াড়ের লোকেরা সেইদিন থেকে তাঁকে ভক্তি করতে সুরু করলো।

পরের দিনও এই ভাবে কাটলো। তিনি সকলকে ভগবান যীশুর বাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন। বলতে লাগলেন : যীশুর মত নির্যাতন সহ্য করবার শক্তি সঞ্চয় করো। ভগবান তোমাদের কথা শুনবেন এবং মনে বল দেবেন।

সবাই টমকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো।

কয়েকদিন পরে হেলী ওদের নিয়ে ষ্টীমার ঘাটে এলো। উদ্দেশ্য ষ্টীমারে করে বাজারে নিয়ে যাবে এবং অনেক দামে বেচে মুনাফা করবে।

ষ্টীমার ঘাটে এসে হেলী একটা মোটা টাকার কাজ পেয়ে গেল। ক্রীতদাসদের দিয়ে সমস্ত তুলোর গাঁইট ষ্টীমারে তুলে দিতে হবে। তা'তে মোটা টাকা আসবে।

হেলী রাজী। এবং তখনই ক্রীতদাসদের কাজে লাগিয়ে দিল। এ কাজে শ্রমের শেষ নেই। কিন্তু সবাই মুখ বুঁজে সে কাজ করে যেতে লাগলো। হেলী তদারকী করতে লাগলো।

ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হেলীর কাজ দেখছিলেন। তাঁরা হেলীর কাজের তারিফ ও করছিলেন। একটি মেয়ে তার বাবাকে বললোঃ দেখেছো বাবা, ওদের দিয়ে কি রকম কাজ করিয়ে নিচ্ছে। যারা কাজ করতে পারছে না তাদের পিঠে বেত পড়ছে। এটা অন্যায় বাবা। তুমি এর প্রতিবাদ করছো না কেন?

মেয়েটির বাবা বললেনঃ ওরা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। ওরা পরিশ্রম করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে। এটাই ওদের কাজ।

মেয়েটির কিন্তু সে কথায় মন মানলো না। সে তার পিসীর কাছে গিয়ে সে কথা জানালো। কিন্তু পিসীও সে কথা কানে তুললো না। তখন মেয়েটি মনমরা হয়ে ঐ ডেকে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ কাজে টম সব চেয়ে বেশী পরিশ্রম করলেন। এবং হেলী তার কাজে অত্যন্ত খুশি হল।

কাজ শেষ হলে সকল ক্রীতদাসকে ঐ ষ্টীমারের ডেকের নীচে মাল রাখবার জায়গায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হল। দম্ বন্ধ হবার অবস্থা। প্রত্যেকের হাতে পায়ে শেকল লাগানো। নড়-চড়ার কোন উপায় নেই। ষ্টীমার চলতে লাগলো। সামনের বাজারে ওদের মোটা দামে বেচা হবে।

ক্রীতদাসেরা চিৎকার শুরু করে দিল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে একটুও আলো বা হাওয়া নেই। তাদের ডেকের ওপরে আনতে হবে।

ওদের কথা শুনে হেলীর মাথা গরম হয়ে গেল। সে ডেকের নীচে গিয়ে প্রত্যেককে চাবুক পেটা করতে লাগলো। এবং শেষে টমের কাছে গিয়ে

দেখলো যে তিনি ধ্যান মূর্তিতে বসে ভগবানের নাম করছেন। হেলী হতবাক হয়ে ওপরে চলে গেল।

টম বোঝাতে লাগলেন এবং সকলকে কাছে বসিয়ে ভগবানের নাম গানে ঐ ডেকের অন্ধকার কুঠরী ভরিয়ে দিলেন।

হেলী অবাক হল। এবং টমকে বললো: টম, আমি যদি তোমাকে ডেকে আসবার অনুমতি দি', তবে তুমি কি পালিয়ে যাবে?

টম বললো: আমি অকৃতজ্ঞ নই। শেল্বী আমাকে ভাল করেই জানে। আমি সব সময়ই আমার মনিবের সম্মান রেখে চলি। এবং এটা কর্তব্য বলেই মনে করি।

হেলী বললো: বেশ! তুমি এখন থেকে ডেকে স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করতে পারো। আমি তোমাকে সে অনুমতি দিলাম।

টম হাত জোর করে বললো: আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।

: বলো। হেলী টমের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

আমাকে আপনি একজন ভাল লোকের কাছে বেচবেন। যাতে আমি সারা জীবন ভগবানের নাম-গান করতে পারি। এবং নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। আপনার কাছে এটাই আমার প্রথম এবং শেষ অনুরোধ। হেলী বললো: আমি চেষ্টা করবো।

সেইদিন থেকে টম স্বাধীন ভাবে ঐ ষ্টীমারের ডেকে চলাফেরা করবার অনুমতি পেলেন।

টমাস হিউজেস্

[টমাস হিউজেস ইংলণ্ডের বাসিন্দা। সেখানেই তাঁর জন্ম। তাঁর জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। পিতার নাম জন হিউজেস। জন হিউজেস একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নাম 'বসকম্ব ট্রাক্টস'। টমাস্ হিউজেস ছোটবেলায় রাগবি স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন।

টমাস হিউজেস একজন ভাগ্যবান লেখক। তিনি জীবনে বেশী বই লেখেননি। যে ক'খানা বই তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে "দি স্কাউয়ারিং অফ হোয়াইট হর্স", "টম ব্রাউন অ্যাট অক্সফোর্ড" বিশেষ ভাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁকে অমর করে রেখেছে যে বইটি, সেটা হল "টম ব্রাউন স্কুল ডেজ"।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বই লিখে তিনি যে খ্যাতি পান, তা' অন্য কোন বই লিখে পাননি। এই বইতে তিনি তাঁর রাগবি স্কুলের জীবন ধারার নিখুঁত বিবরণ সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন। বইটি আজো পাঠকদের কাছে সমান ভাবে আদর পেয়ে আসছে।]

টমাস হিউজেস্ | রাগবি শিক্ষা

ঃ বাবা তা'হলে আসি। মাকে আমার কথা জানিও। টম শেষবারের মত তার বাবার হাতে হাত মেলালো। তারপর গাড়ীর ছাদে লাফিয়ে উঠলো। গার্ড এক হাতে টমের টুপিটা নিয়ে অপর হাতে শিঙ্গায় ফুঁ দিল।

শিঙ্গা বাজতে লাগলো। সহিসেরা ঘোড়ার লাগাম আল্‌গা করে দিল। সেই সঙ্গে চারটে ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। ট্যালিহো মুহুর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাত্রা করবার পর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল।

টম গাড়ীর মাথার দাঁড়িয়ে। বাবাকে যতক্ষণ দেখা যায় সে দেখতে লাগলো। বাবার মূর্তি সরে যেতে যেতে শেষে আর দেখা গেল না। গার্ড টমের জিনিষ-পত্র ভেতরে রেখে, টমের পাশে এসে বসলো। তার কোটের

বোতাম ভাল করে এঁটে দিল। এবং রাত্রি-শেষের তিন ঘণ্টার প্রচণ্ড শীতের মোকাবিলা করবার জন্যে ওরা তৈরী হল। এ কাজ সহজ নয়। নভেম্বরের শীত। রাতের শেষ প্রহর। ঝড়ের বেগে গাড়ী ছুটছে। সেই গাড়ীর ছাদের ওপর বসে থাকার অর্থই হল জমে যাওয়া।

তোমরা এ যুগের ছেলে। নরম ধাতুতে তৈরী। বেড়াবার সময় তোমাদের নানা জিনিষের দরকার হয়ে পড়ে। তোমাদের কম্বল বা ওভার কোট চাই। শরীরের উত্তাপ যাতে শরীরেই থাকে, তার জন্যে নানা উপায় তোমরা বার কর। এবং এতেই শেষ নয়। তোমরা কখনও ভ্রমণে বেরুলে প্রথম শ্রেণীর কামরায় গদী আঁটা আসনে বসে ভ্রমণ কর। এবং শীতের ভয়ে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখ। কিন্তু আমাদের কালে এমন ছিল না। আমাদের ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম।

শেষ রাতের ঠাণ্ডার মধ্যেও আমি ট্যালিহোর ছাদে বসে আছি। আমার পা দুটো দুলছে। ঠাণ্ডায় জমে আসছে। আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি যে ঠাণ্ডা কি জিনিষ। আমার-ই পা দু'খানা যে আমার-ই শরীরের সঙ্গে জুড়ে আছে, সেটা ঠাণ্ডায় শত চেষ্টাতেও বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু তবুও এত কষ্টের মধ্যেও যেন আনন্দ পাচ্ছি। কষ্টে কাতর না হয়ে, আমি যে কষ্টটা সহ্য করতে পাচ্ছি, সেইটাই আমাকে আনন্দ দিচ্ছে এবং গৌরবের বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন কোন কিছুর সঙ্গে দিবারাত্র লড়াই করেও হার মানছি না। সেইজন্যে বিজয়ের গর্বে আমার বুকটা বার বার ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। পথে চলতে চলতে একটা সংগীত আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। সমস্ত সংগীতের মিলিত একটা ঐক্যতান। ঘোড়ার গলায়, মাথায়, এবং লাগামে নানা প্রকারের ঘন্টি দিয়ে সাজানো। সেই মিলিত ঘন্টির ঝম্ ঝম্ আওয়াজ একটা ঐক্যতান সৃষ্টি করছে। আর সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ শব্দ। রাতের বুকে আওয়াজটা যেন বেশী করে শোনা যাচ্ছে। ট্যালিহোর সামনের দুটি উজ্জ্বল আলো, সামনের তুষারপাত ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে। গার্ডের সিঙ্গা মাঝে মাঝে বেজে উঠে পরবর্তী

সরাইখানাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই আওয়াজে পরবর্তী সরাইখানার, ঘুমকাতুরে দারোয়ানের ঘুমও ভেঙ্গে যেতে পারে। এবং নবাগত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী হতে পারে। ট্যালিহোর সকল যাত্রীরাই প্রভাতের আলোর প্রতীক্ষায় জেগে। কখন উষা তার আলো এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে এবং শরীরে উত্তাপ এসে লাগবে। তখন নিঃসাড় পা দু'টো-তে আবার সাড়া জাগবে। আবার একটু একটু করে অনুভূতি ফিরে আসবে।

তারপর ট্যালিহোর ছাদে বসে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা। সে সৌন্দর্য চলতি গাড়ীর ছাদে বসে না দেখলে সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করা যায় না। ধাবমান গাড়ীর জন্যে প্রতিনিয়ত সামনের দৃশ্যপট গুলো চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাবে। আর সেই সঙ্গে সূর্য ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে হামা দিয়ে উঠে আসবে। এবং সেই তালে বাজবে ঘোড়ার লাগামের ঝুমঝুমি। তবেই তো আনন্দ। তবেই তো স্থান পরিবর্তনের উপলব্ধি।

একটানা চলতে চলতে সেন্ট্ আলবান পেরিয়ে এলো ট্যালিহো। এ চলার আনন্দ টম উপলব্ধি করলেও, শীতে প্রায় জমে যাবার মত অবস্থা। গার্ড এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এখন সে একরাশ খড় এনে টমের পা-দু'টো চাপা দিয়ে দিল। গরম হবার জন্যে। আর জানুর ওপর চাপিয়ে দিল একটা বস্তা। ঘন অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যায় না। সেইজন্যে দৃষ্টি বার বার বাধা পাচ্ছে। কিন্তু তার ফলে মন অন্তর্মূখী হচ্ছে। চোখের দৃষ্টি বাধা পেয়ে মনের দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। টম ট্যালিহোর ছাদে বসে এই ছোট্ট জীবনের নানা কথা চিন্তা করছে। নানা কাজ, নানা প্রতিশ্রুতি আজ তার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই নির্জন রাতে আজ তার মায়ের কথা মনে পড়ছে। বোনেদের কথা। এবং সব শেষে বাবার শেষ উপদেশের কথা। টম এই সব চিন্তা করতে করতে এটুকু সময়ের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটা সৎ সঙ্কল্প করে বসলো। এবং সব শেষে সে সঙ্কল্প করলো যে সে ব্রাউন বংশের নাম রাখবে।

তারপর সে ভাবতো লাগলো, তার নিজের ভবিষ্যতের কথা। একটা

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে সে বাস করবার জন্যে চলেছে। চিন্তা করতে করতে হাজার প্রশ্ন যেন টমকে ঘিরে ধরলো। রাগবি কেমন জায়গা? ছেলেরা কেমন? কি করে সেখানে? অন্যান্য বড় বড় স্কুলের ছেলেদের সম্পর্কে তার একটা মোটামুটি ধারণা আছে। নানা গল্প সে শুনেছে। কিন্তু এখানে? নানা চিন্তা টমকে ঘিরে ধরতে লাগলো। কিন্তু তার মধ্যেও সে অজানিত এক আনন্দে ভরপুর। নতুন জায়গা। নতুন জীবন। সামনে গার্ড বসে তাই টম নিজেকে সামলে নিল। তা' না হলে সে হয় তো গলা ছেড়ে গানই গেয়ে উঠতো।

অনেক পথ চলার শেষে রাত ফুরিয়ে এলো। পূব আকাশে ঊষার আলো দেখা গেল। ট্যালিহো সামনের একটা ছোট্ট সরাইখানাতে এসে থামলো। সামনের দরজা খোলা। যেন আগন্তুকের প্রতীক্ষায়। ভেতরে আগুন জ্বলছে। কোচ্‌ম্যান বেশী তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে দু'মিনিট সময় বাঁচিয়েছে। এই শীতের রাতে সেইটাই বা কম কি। এই বাঁচানো দু'মিনিট আহার-বিহারে ব্যয় করা যাবে। বিশ্রাম নেওয়া যাবে। কোচ্‌ম্যান তার হাতের চাবুক সহিসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামলো। হাতের শিঙ্গাটা গাড়ীতে ঝুলিয়ে রেখে গার্ড ও নামলো। সে নীচে নেমে টমকে বললোঃ আপনি লাফিয়ে নেমে আসুন। এখানে আমি আপনাকে এমন কিছু খাওয়াবো, যা'তে আপনার শরীর গরম হয়।

কিন্তু টমের পক্ষে নেমে আসা অসম্ভব। তার হাত-পা অবস। শরীরে কোন জোর নেই। গার্ড তাকে ধরে নামিয়ে সামনের সরাইখানায় এনে বসালো। তারপর কিছু গরম পাণীয় খেতে দিল। টম সেটা খেয়ে ফেললো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আবার তাজা হয়ে উঠলো। সেখানে কিছুটা বিশ্রামও হল। হাতের দু'মিনিট অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আবার যাত্রা শুরু। পরবর্তী সরাইখানার দিকে।

সূর্য হামা দিয়ে আকাশের গায়ে উঠে আসছে। ট্যালিহোর ছাদে বসে টম সূর্য ওঠা দেখছে। গাছ-গাছালীর পাশ দিয়ে সূর্য পথ করে করে ওপরে উঠে আসছে। রাস্তায় দু'একটা গাড়ী দেখা যাচ্ছে। ওরা বাজারের

পথে চলেছে। মজুরেরা চুরুট মুখে কাজে চলেছে। রোদ গাছ-গাছালীর মাথার ওপর দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। কুয়াশার সঙ্গে সকালের রোদ জড়িয়ে যেন এক রুপোলী পর্দার মত দেখাচ্ছে। শিকারী শিকারে চলেছে। সঙ্গে একপাল কুকুর। উল্টোদিক থেকে আরেকটা গাড়ী এসে ট্যালিহোর সামনে দাঁড়ালো। ছু'জন কোচম্যানই ছু'জনকে নমস্কার জানালো।

ট্যালিহো ছুটছে। সকাল সাড়ে সাতটায় আরেকটা সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ালো। এ সরাইখানা আগের চেয়ে অনেক বড়। এখানে অনেক খাবার আর মাংস পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। টেবিলে প্রচুর রুটি। পরিবেশক টমকে প্রশ্ন করলো: আপনার কফি না চা?

টম বললো: কফি।

খাওয়া সারতে কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিশ্রাম। টুকিটাকি কাজও সেরে নেওয়া হল। তারপর আবার যাত্রা।

এ জায়গা গার্ডের পরিচিত। নিত্য তার আনাগোনা। রাগবির অনেক ছেলেদের সে চেনে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত। তাদের সে ভালবাসে। রাগবি-ছেলেরাও তাকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। এবারে সে বলতে শুরু করলো। সে টমকে নানা গল্প-শোনাতে লাগলো। আশ্চর্য সব গল্প। টম একমনে শুনতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো যে, এসব গল্প যদি সত্যি হয়, তবে সারা ছুনিয়াতে রাগবি ছেলেদের মত এমন ছুঃসাহসী ছেলে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। গর্বে টমের বুকও ফুলে উঠতে লাগলো। সে নিজেও এখন রাগবির ছাত্র হতে চলেছে। কিছুদিন পরে সে নিজেও ঐ রাগবির ছেলেদের মত ছুঃসাহসী আর বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারবে।

ট্যালিহো একটা রাস্তার মোড় নিল। গার্ড বললো: ঐ যে দূরে রাগবি দেখা যাচ্ছে। আর মাত্র ছু'মাইল।

ট্যালিহো ছুটতে লাগলো।

পথে ছুটি ছেলে জামার বোতাম এঁটে গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে লাগলো। কোচম্যান গাড়ীর বেগ একটু কমিয়ে দিল। ছেলেছুটি এতে আরো

উৎসাহ পেল। প্রায় এক মাইল তারা গাড়ীর সঙ্গে ছুটে এলো। তারপর তারা হাঁপাতে হাঁপাতে থামলো। ট্যালিহো ও থামলো।

গার্ড ঘড়ি দেখে বললো : চার মিনিট ছাপান্ন সেকেণ্ড। অর্থাৎ পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে তারা এক মাইল দৌড়ে এসেছে। ট্যালিহো থামতেই দলে দলে ছেলেরা এসে ভীড় করতে লাগলো। ট্যালিহো ঘিরে ফেললো। টম অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগলো। ওরাও টমকে দেখছে। বারোটা বাজবার দশ মিনিট আগেই ওরা শহরে এসে পৌছে গিয়েছে। টম লম্বা একটা নিশ্বাস নিল। ভাবলো এমন আনন্দের দিন আগে কখনো আসেনি।

রাতে শুতে যাবার আগে টম ভাবলো, আজকের দিনটাই তার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। যা' সে জীবনে ভুলতে পারবে না।

ডবলু ডবলু জ্যাকবস্

জ্যাকবস-এর জন্ম এবং পড়াশোনা লণ্ডনে। ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে একটি ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। এবং অবসর সময়ে লেখার সাধনা করতে থাকেন। উত্তরকালে তিনি ছোট গল্পকার এবং নাট্যকার হিসাবে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে একজন বলে গন্য হন। তাঁর রচনার মধ্যে "Many Cargoes" (1896) "Hight Freight (1901) Odd Crafts" (1903) এবং "Night watches" (1914) বিশেষ প্রসিদ্ধ। যদিও সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর লেখা অনেক নয়। কিন্তু তবুও সমালোচকদের মতে গুণের দিক থেকে যথেষ্ট। সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর লেখার ষ্টাইল ও পরিবেশনা অনেক সময় শ্রেষ্ঠ গ্রীক কমিক লেখক-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'ছোট গল্প' লেখক হিসাবে জ্যাকবস সব সময় অল্প পরিধির মধ্যে কাজ করতে ভালবাসতেন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলো বিচিত্র পরিবেশ এবং পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্পে উপস্থিত। জ্যাকবস্-এর গল্পে সংলাপ ও কথোপকথনগুলো ভারী চমৎকার। গল্প কোথায় এবং কখন ঘুরিয়ে বলতে হবে এবং নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এ বিদ্যা তাঁর সহজাত ছিল। তাঁর গল্পে এবং নাটকে অতি প্রাকৃতিক বিষয়ক কোন ঘটনা বা ভূত-বিষয়ক কোন চরিত্র, গল্প এবং নাটককে আরো জমাটি করে তুলেছে।

'বানরের থাবা' জ্যাকবস্-এর এই ধরনের একটি গল্প। ইংরাজী সাহিত্যে এই গল্পটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'বানরের থাবা' গল্পের মূল বক্তব্য হল অস্বাভাবিক ভাবে বা অতি প্রাকৃতিক কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের ভাগ্যে পরিবর্তন আনতে গেলে তার ফল ভাল হয় না। মানুষের ভাগ্যই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ব্যক্তি অস্বাভাবিক কোন উপায়ে নিজের নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যকে বদলাবার চেষ্টা করে, সে তার জীবনে অকারণ দুঃখ এবং কষ্টই ডেকে আনে।]

ডবলু ডবলু জ্যাকবস্ | বানরের থাবা

শীতের রাত। জমাটি ঠাণ্ডা। রাত যত বাড়ছে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। সেই সঙ্গে অন্ধকার ও ঘন হয়ে আসছে। লেকশ্যাম ভিলার বাইরের ঘরেও ঘন অন্ধকার। দূরে আগুন থাকা সত্বেও জমাটি আঁধার হালকা হয়নি। ছায়া থমথমে ঘরে বসে একজন ভদ্রলোক তাঁর ছেলের সঙ্গে দাবা খেলছেন।

তিনি ভাল খেলুড়ে। নানা কৌশলে ছেলেকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পেরে উঠছেন না। কারণ ছেলেও পাকা খেলোয়াড়। ছেলের মা আগুনের পাশে একটি চেয়ারে বসে উল বুনছেন আর খেলা দেখছেন। তাঁর মাথায় সব চুলই প্রায় শাদা। দেখলেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। তিনি ওদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠছেন এবং মাঝে মাঝে কথা বলছেন।

ভদ্রলোকের নাম মিঃ হোয়াইট্। তিনি খেলার মাঝে হঠাৎ একটা মারাত্মক ভুল করে বসলেন। এবং সেই ভুলটা ছেলের নজরে পড়বার আগেই ভদ্রভাবে শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন সেটা সম্ভব হল না, তখন ছেলের নজরটা মায়ের দিকে সরিয়ে আনবার জন্যে স্ত্রীকে বললেন : বাইরে কী জোরে বাতাস বইছে শুনতে পাচ্ছ ?

ভদ্রলোকের স্ত্রী কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর নজর দাবার ওপর রেখেই বললেন : পাচ্ছি। কারণ ছেলে খেলায় হেরে যাবে এটা তার ইচ্ছে নয়।

ভদ্রলোক তখন শান্ত ভাবে দাবার বোর্ডে হাত রেখে বললেন : বাইরে যা ঠাণ্ডা। আমার মনে হয় না যে আজ রাতে সে এখানে আসবে।

এতক্ষণে ছেলেটি মুখ তুলে বললো : বাবা ! তুমি কিন্তু হেরে যাচ্ছ।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : বুঝতে পেরেছি। এখন তুমি উঠে যেতে চাইবে। এটা কিন্তু অন্যায়।

ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীকে স্বান্তনা দিতে গিয়ে নরম গলায় বললেন : হতাশ হোয়ো না। পরের বারে তুমি জিতবে।

ভদ্রলোক একটু হেসে নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ছেলের কাছেই বাধা পেলেন।

হারবার্ট বলে উঠলো : মা গেট্ টানার শব্দ পেলাম কিন্তু।

মিসেস্ হোয়াইট্ উল বোনা থামিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। একজনের ভারী পায়ে হেঁটে আসবার শব্দ পাওয়া গেল।

হারবার্ট বললো : আমার মনে হয় তিনি আসছেন।

হারবার্টের বাবা এবারে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে একজন ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলেন।

যিনি ঘরে এলেন, তার নাম সার্জেন্ট মেজর মরিস্। ভদ্রলোক বয়সী। লম্বা এবং স্থূলকায়। চোখ দুটো অনেকটা জপের মালার গুটির মত।

তিনি হাসি মুখে মিঃ হোয়াইটের স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আগুনের পাশে একটি চেয়ার টেনে আরাম করে বসলেন। মিঃ মরিস মিঃ হোয়াইটের দীর্ঘ দিনের বন্ধু। মিঃ হোয়াইট্ মিঃ মরিসের জন্যে হুইস্কির ব্যবস্থা করলেন। আজ এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে হুইস্কির ব্যবস্থা না করলে গল্প জমবে না। তিনি হুইস্কির ব্যবস্থা করে সামনের আগুনে চায়ের কেটলী চাপিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

মিঃ মরিস কোন কথা না বলে প্রথমেই পর পর তিন গ্লাস হুইস্কি পান করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ দুটো বড় এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘরে উপস্থিত তিনজন গল্প শোনার জন্যে উসখুস করছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, এবারে মিঃ মরিস একটা চমৎকার যুদ্ধের গল্প কিম্বা আশ্চর্য সব মানুষের কথা শোনাবেন।

মিঃ হোয়াইট্ চুপ করেই ছিলেন। এবারে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে বললেন: প্রায় একুশ বছর পরে আবার মিঃ মরিসের সঙ্গে আমার দেখা। একুশ বছর আগে, ও ছিল যুবক এবং অত্যন্ত রোগা। তখন সে একটা গুদোমে কাজ করতো। আর এখন ওর চেহারাটা একবার দেখ।

মিঃ হোয়াইটের কথা শুনে মিসেস্ হোয়াইট লজ্জিত হলেন। মিঃ মরিস কিন্তু নির্বিকার। মিসেস্ হোয়াইট সে লজ্জা চাপা দেবার জন্যে নরম গলায় বললেন: না। না। এমন কি আর মোটা হয়েছেন উনি।

মিঃ মরিস তখনও কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। মিঃ হোয়াইট্ তাঁর নজরটা এদিকে ফেরাবার জন্যে বললেন: শোনো মরিস! আমি ভারতবর্ষে যেতে চাই।

মিঃ মরিস কথা শুনে মিঃ হোয়াইটের দিকে তাকালেন। তারপর তাঁর

হুইস্কির গ্লাসটা শেষ বারের মত নেড়ে নিজের মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন : আমার মনে হয় তোমার এখানেই থাকা উচিত।

মিঃ হোয়াইট্ বললেন : না। আমি ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানকার পুরোনো মন্দির, ফকির এবং বনের জীব-জন্তুদের দেখতে চাই। পরে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে যেতে তিনি বললেন : আচ্ছা, মরিস ! তুমি সেদিনে বানরের থাবা বা সেই জাতীয় কিছু একটা আমাকে বলছিলে।

: না। না। ও কিছু না। মিঃ মরিস তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে চাইলেন।

মিসেস্ হোয়াইট কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললেন : বানরের থাবা !

মিঃ মরিস খুব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন : হ্যাঁ ! আমার মনে হয় কোন ম্যাজিক-ট্যাজিক হবে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে খালি হুইস্কির গ্লাসটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এসে পরে আবার নামিয়ে রাখলেন। তা'দেখে মিঃ হোয়াইট্ আবার সেটা পূর্ণ করে দিলেন। এবং তিনজনেই তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বসলেন।

মিঃ মরিস তখন প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন এবং শেষে নিজের পকেট হাতড়ে একটা শাদা কাগজ বার করে তাদের সামনে তুলে ধরে বললেন : দেখো ! এটা একটা সাধারণ থাবা। পুরোনো মমি থেকে নেওয়া।

তিনি কাগজখানা মিসেস হোয়াইটের দিকে মেলে ধরলেন। মিসেস্ হোয়াইট্ সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে সেটা মিঃ মরিসের হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল।

মিঃ হোয়াইট্ আবার তখনই সেটা ছেলের হাত থেকে নিয়ে নিজে ভাল করে পরীক্ষা করতে করতে টেবিলে রেখে বললেন : এর বিশেষত্বটা কি ?

মিঃ মরিস বললেন : একজন বৃদ্ধ ফকির এটা আমাকে দিয়ে একটি প্রবাদ বাক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সত্যিই একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রতিটি মানুষ তার ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি কেউ তার ভাগ্যকে কোন কিছু প্রক্রিয়ার

দ্বারা বদলাবার চেষ্টা করে, তা'হলে সে নিজের জীবনে দুঃখই ডেকে আনে। তিনি বলেছিলেন ঃ তিনজন মানুষ আলদা আলদা ভাবে তিনটি ইচ্ছা এই থাবার কাছে চাইতে পারবে।

মিঃ মরিস এবারে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না। ঘরে তখন একটা স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

একটুক্ষণ পর মিঃ হোয়াইটের ছেলে হারবার্ট একটু ঘুরিয়ে এবং চালাকী করে বললো ঃ তা'হলে আপনি আপনার যে কোন তিনটি ইচ্ছা এই থাবার কাছে চাইলেন না কেন ?

মিঃ মরিস গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ আমি চেয়েছি। তারপরেই তিনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং তার মুখ এত ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে, ঘরের উপস্থিত সকলে তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। তারপর মিসেস্ হোয়াইট অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন ঃ আপনার বাঞ্ছিত সেই তিনটি ইচ্ছা কি সত্যিই ফলবান হয়েছিল।

ঃ হ্যাঁ! মিঃ মরিস মুখ দিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি হুইস্কির গ্লাসটা নিজের দাঁতে জোরে চেপে ধরলেন।

মিসেস্ হোয়াইট্ তখন সাহস পেয়ে আবার বললেন ঃ আর কেউ কি এই থাবার কাছে কোন প্রকার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল ?

মিঃ মরিস বললেন ঃ প্রথম ব্যক্তি এই থাবার কাছে তাঁর তিনটি ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল। এবং তিনটিই ফলবান হয়েছিল। প্রথম দুটি তিনি কি চেয়েছিলেন আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁর তৃতীয় ইচ্ছা ছিল মৃত্যু। এবং সেই কারণেই এই থাবাটি আমার হাতে এসেছে।

তিনি কথা কয়টি বলে চুপ করে গেলেন। এবং তাঁর বলার ভঙ্গিটি এত গম্ভীর ছিল যে, আর কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না।

ঘরে আবার একটা নীরবতা নেমে এলো।

শেষে মিঃ হোয়াইট্ বললেন ঃ তুমি যদি তোমার তিনটি ইচ্ছাই পেয়ে থাক, তবে এটা অকারণ আর তোমার কাছে রেখেছ কেন ?

মিঃ মরিস মাথা নেড়ে বললেন ঃ সখ মেটাবার জন্যে। পরে তিনি আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমি ভেবেছিলাম এটা বেচে দেব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ এই থাবার ছাপটি ইতিমধ্যেই কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে। তা'ছাড়াও লোকে এটা কিনতে চাইবে না। কারণ কিছু লোক ভাববে যে, আমি মিথ্যা একটি গল্প বানিয়ে সকলকে বলে বেড়াচ্ছি। আবার কেউ হয়তো তাদের ভাগ্যকে আগে যাচাই করে দেখে পরে দাম দিতে চাইবে। সুতরাং—

মিঃ হোয়াইট তখন মিঃ মরিসের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন ঃ তুমি যদি আবার নতুন করে তোমার তিনটি ইচ্ছার কথা জানাও তাহলে ফলবে কি ?

ঃ আমি জানি না। কারণ এ প্রশ্নের জবার আমার জানা নেই। তিনি কথা বলতে বলতে সেই বানরের থাবার ছাপটি আল্‌তো ভাবে নিজের দু'আঙ্গুলে ধরে হঠাৎ আগুনে নিক্ষেপ করতে গেলেন।

মিঃ হোয়াইট্ এটার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো। তিনি তাঁর বন্ধুকে থামাতে গেলেন। এবং শেষে কেড়ে নিলেন।

মিঃ মরিস গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ না। না। তুমি ওটাকে পুড়ে যেতে দাও।

মিঃ হোয়াইট্ বললেন ঃ তুমি যদি এটা আর না রাখতে চাও তবে আমাকে দাও।

মিঃ মরিস তখন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন ঃ না। তোমাকে দেব না। আমি এটা আগুনেই ফেলে দেব। তুমি যদি আমার কথা না শুনে এটা তোমার কাছে রাখ, তবে ভবিষ্যতে এর ফলের জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারবে না। কাজেই আমি বলি তুমি সুস্থ মানুষের মত এটা আগুনে ফেলে দাও।

মিঃ হোয়াইট ছবিটি ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন ঃ তুমি এটা নিয়ে আর কি করবে। এটা আমার কাছে থাক।

ঃ বেশ ! কিন্তু ফলাফলের জন্যে আমি দায়ী নই জানবে। তা'হলে তুমি এখন ওটাকে তোমার ডান হাতে উঁচু করে তুলে, তোমার ইচ্ছার কথা জোরে জোরে বলো। আমরা শুনি।

মিসেস্ হোয়াইট্ তখন হেসে বললেন ঃ হ্যাঁ ! আরব্য-রজনীর গল্পের মত জোরে জোরে বল। যাতে সবাই শুনতে পায়। তিনি কথা শেষ করে রাতের খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন ঃ দেখো বাপু, তুমি আবার আমার জন্যে চার জোড়া হাত চেয়ে বোসোনা।

ঘরের সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। মিঃ হোয়াইট্ সেই থাবার ছবিটা হাতে নিয়ে তাঁর ইচ্ছার কথা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মিঃ মরিস বললেন ঃ আমি আশা করি, তুমি স্বাভাবিক কিছু একটা চাইবে। অস্বাভাবিক কিছু চাইবে না।

মিঃ হোয়াইট্ হঠাৎ একটা নতুন সিদ্ধান্তে এলেন। তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে সেটা নিজের পকেটে রেখে দিলেন। সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকালেন এবং কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু ঠিক তখনই রাতের খাবার আসাতে, সকলে সেই থাবার কথা ভুলে একটি টেবিলে গোল হয়ে বসে খেতে শুরু করলেন। খাওয়া চলতে লাগলো। সকলেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর মিঃ মরিস অন্য প্রসঙ্গে এলেন। তিনি যুদ্ধের গল্প বলতে লাগলেন। সৈনিকদের বীরত্বের গল্প। এবং ভারত অভিযানের গল্প। উপস্থিত সকলে মন দিয়ে গল্প শুনতে লাগলেন।

এই ভাবে রাত বাড়তে লাগলো এবং এক সময় তাঁদের আহারও শেষ হল। মিঃ মরিস শেষ ট্রেনের যাত্রী। তাঁর আর অপেক্ষা করা চলে না। তিনি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হারবার্ট তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলো। সে কিন্তু থাবাটির কথা ভোলেনি। সে এবারে এগিয়ে এসে বললো ঃ বানরের থাবা সম্পর্কে উনি যা বললেন, তা' যদি সত্যি হয় তবে আমরা এটা ভাঙ্গিয়ে অনেক কিছু করতে পারবো। আচ্ছা বাবা, তুমি কি তাঁকে এর মূল্য হিসাবে কিছু দিয়েছ ?

ঃ যৎসামান্য। সে চায় নি। আমি তাকে প্রায় জোর করেই দিয়েছি। কিন্তু তবুও সে ওটাকে আগুনে ফেলে দেবার জন্যে বার বার চাপ দিচ্ছিলো।

হারবার্ট হাসতে হাসতে বললোঃ স্বাভাবিক। এখন আমরা ওটা দিয়ে শুধু ধনী বা খ্যাতিবান হতে চাইবো না। আমরা আরো বেশী কিছু চাইবো। হারবার্ট বুক ফুলিয়ে বললোঃ আমরা রাজা অথবা সম্রাট হতে চাইবো। তবেই আমরা সুখী হতে পারবো।

মিঃ হোয়াইট্ নিজের পকেট থেকে বানরের থাবার ছবিটি বার ক'রে আলোতে ধরে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখতে দেখতে আপন মনেই বললেনঃ সত্যি কথা বলতে কি, কী চাইবো সেটা আমি নিজেই ভাল করে জানি না। আমার মনে হচ্ছে, আমি যা' চাই তা' পেয়ে গেছি।

হারবার্ট তখন কাছে এসে বললোঃ আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার বাকী বাড়ী ভাড়ার টাকাটা দিতে পারলেই খুশি। তা'হলে আপাতত তুমি তোমার জন্যে দুশো পাউণ্ডই চাও। দেখো কি হয়।

হারবার্টের বাবা সে কথায় খুশি হলেন। তিনি ঐ দুশো পাউণ্ড চাইবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। হারবার্ট তার প্রস্তুতি পর্ব দেখে মায়ের দিকে তাকালো এবং আনন্দে পিয়ানোর কাছে বসে একটি সুন্দর সুর বাজাতে লাগলো।

হারবার্টের বাবা তখন বানরের থাবার ছবিটি ডান হাতের দু' আঙ্গুলে তুলে ধরে স্পষ্ট এবং জোর গলায় বলতে লাগলেনঃ আমি দু'শো পাউণ্ড পেতে ইচ্ছা করি।

হারবার্টের পিয়ানোর সুর এবং পিতার ইচ্ছার ধ্বনি এক হয়ে কিছুক্ষণ ঐ ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তারপরেই মিঃ হোয়াইটের আর্ত চিৎকার ঐ ঘরে একটা বেসুরো আওয়াজ তুললো।

হারবার্ট এবং তার মা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ছুটে গেলেন। মিঃ হোয়াইট বললেনঃ আমি যখনি আমার ইচ্ছার কথা জোরে জোরে বলেছি, তখনই মনে হল একটা সাপ যেন আমার সমস্ত হাতে বিষ ঢেলে দিল।

হারবার্ট তার মায়ের দিকে তাকালো। মা তাঁর স্বামীর হাত ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। মিঃ হোয়াইটের সুস্থ হ'তে একটু সময় লাগলো। তিনি সুস্থ হ'তে, হারবার্ট বললো: আমি কিন্তু এ ঘরে কোথাও টাকা দেখতে পাচ্ছি না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমরা আদৌ টাকা দেখতে পাব না। এটা স্রেফ্ একটা বুজরুকী।

মিসেস হোয়াইট্ বললেন: তুমি যে ব্যাথাটা অনুভব করলে, আমার মনে হয় ওটা তোমার মানসিক দুর্বলতা।

মিঃ হোয়াইট বললেন: তা' হতে পারে। কিন্তু তবুও আমি বলবো যে ওটা আমাকে বেশ নাড়া দিয়ে গেছে। আমি বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছি।

তারা তিনজন চুপচাপ বসে রইলেন। কোন কথা বললেন না। বাইরে বাতাসের শব্দ আরো জোরে শোনা যেতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ দোতালার দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ পাওয়া গেল। বৃদ্ধ মিঃ হোয়াইট্ আবার নতুন কোন বিপদের আশঙ্কায় ওপরের দিকে তাকালেন। তারপর সব চুপচাপ। আর কোন শব্দ বা আওয়াজ শোনা গেল না। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো। তাঁরা অনেকক্ষণ ওখানে বসে থেকে নিজেদের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

হারবার্ট শুতে যাবার আগে, তার বাবা এবং মাকে বললো: আশা করি তোমাদের বিছানার ঠিক মাঝখানে একটা বড় ব্যাগে বাঁধা ঐ টাকাটা দেখতে পাবে। সে কথার জবাবে ওর বাবা-মা কোন কথাই বললেন না। মিঃ হোয়াইট্‌কে কেমন যেন বিষন্ন দেখাতে লাগলো। তিনি নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়, নীচের বসবার ঘরখানা ভ'রে গিয়েছে। প্রাতঃরাসের টেবিলে বসে হারবার্ট গত রাতের কথা ভেবে নিজেই আপন মনে হেসে উঠলো। সকালের উজ্জ্বল আলো এবং টাট্‌কা বাতাস, গত রাতের গুমোট এবং ক্লান্ত বাতাসকে বার করে দিল। তাঁরা বেশ

সতেজ এবং সহজ হয়ে উঠলেন। টেবিলে পড়ে থাকা বানরের সেই নোংরা থাবার ছবিটি এখন বাতাসে উড়ে গিয়ে মেঝেতে অনাদরে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। যার ওপরে আর কারো সত্যিই কোন বিশ্বাস ছিল না।

খাবার টেবিলে প্রথম মুখ খুললেন মিসেস্ হোয়াইট্. তিনি বললেন: আমার মনে হয় সমস্ত সৈনিকেরাই এক রকম। এবং একই কথা বলে। গতকাল তোমার বন্ধু মরিসের কথাগুলো আমাদের শোনাই উচিত হয়নি। আমার এখন মনে হচ্ছে আজকের দিনে চাইলেই সব জিনিষ পাওয়া যায় না। অকারণ দুশো পাউণ্ড আমাদের হাতে আসবে কেন?

হারবার্ট মায়ের কথা শুনে বেশ ঠাট্টা করে বললো: তুমি চিন্তা কোরো না মা। টাকাটা হয়তো আকাশ থেকেও আমাদের মাথায় এসে পড়তে পারে।

মিঃ হোয়াইট্ ছেলের কথা শুনে বললেন: মরিস বলেছিল যে এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে। এবং আমরা যদি ইচ্ছা করি, তবে এই ঘটনা আবার কোন পারস্পরিক ঘটনার কারণও নির্দেশ করতে পারে।

হারবার্ট তার প্রাতঃরাশ শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো: যাই হোক আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা টাকাটা ভাঙ্গিও না।

ছেলের কথা শুনে মিসেস্ হোয়াইট্ জোরে হেসে উঠলেন। তিনি ছেলের সঙ্গে ঘরের দরজা পেরিয়ে সামনের পথটুকু পর্যন্ত গেলেন এবং আবার ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন। মিঃ হোয়াইটের মুখের ভাব দেখে মনে হল, তিনি টাকাটা পাবেন বলে এখনো আশা করছেন। এমন সময় দরজায় পোষ্টম্যানকে দেখে মিসেস্ হোয়াইট্ ছুটে গেলেন। পোষ্টম্যান তাঁর হাতে একটি খাম ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। তিনি খুলে দেখলেন, সেটা একটা দর্জি-দোকানের বিল। অর্থাৎ দর্জি-দোকানের মালিক তার প্রাপ্য টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। তিনি মনে একটু হতাশ হলেন।

এই ভাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো। মিসেস্ হোয়াইটের মনে ধীরে ধীরে একটা ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে মিঃ মরিস, তাঁদের ভাল হোক এটা নিশ্চয়ই চাইবেন না। কারণ তিনি শোষক শ্রেণীর লোক। গরীবের দুঃখে দুঃখী হওয়া বা অনুভূতিশীল হওয়া তাঁর স্বভাবের বাইরে। সুতরাং

তিনি যখন টাকা পাবার একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, তখন সেটা কার্যকরী না হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও মানুষ আশাবাদী। সেই কারণে তিনি সারাদিন ঐ টাকাটা পাবার আশায় রইলেন।

দুপুরে খাবার টেবিলে বসে মিসেস্ হোয়াইট্ তাঁর স্বামীকে বললেন : আমরা কিছু টাকা পাবার আশা করতে গিয়ে দর্জির বিল পেলাম। অর্থাৎ আমাদের কিছু দিতে হবে। হারবার্ট বাড়ী ফিরে এসে এ কথা শুনলে হাসবে এবং নিশ্চয়ই কিছু হাসির কথা বলবে।

মিঃ হোয়াইট্ স্ত্রীর কথা শুনে মুখ থেকে বিয়ারের গ্লাসটা নামিয়ে নিয়ে বললেন : কিন্তু আমি যখন আমার ইচ্ছাটা জোরে জোরে বলছিলাম, তখন কিছু একটা জিনিষ, সেটা সত্যিকারের কি আমি জানি না, আমার হাত বেয়ে নেমে গেল। একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। যে কথা আমি আগেও বলেছি। এবং সেটাই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।

মিসেস্ হোয়াইট্ আস্তে আস্তে বললেন : আমার মনে হয় ওটা তোমার একটা মানসিক দুর্বলতা। অথবা ভ্রান্তি ও বলতে পার। আমার কিন্তু বার বার এ কথাই মনে হচ্ছে।

মিঃ হোয়াইট্ বললেন : না। না। এটা আমার কোন মানসিক দুর্বলতা বা ভ্রান্তি নয়। এটা একটা ঘটনা। আমি যখন হাতটা—।

কথা বলতে বলতে মিঃ হোয়াইট্ বুঝলেন যে, তাঁর স্ত্রী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন : কী ব্যাপার ?

মিসেস্ হোয়াইট্ সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি তখন বাইরে তাকিয়ে একটি লোককে ভাল করে লক্ষ্য করছিলেন। যার চলাফেরার মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ছিল। কেননা, লোকটা বাড়ীতে ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেটা ঠিক করতে না পেরে বারবার দরজার দিকে এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

মিসেস্ হোয়াইটের মাথায় তখন সেই দু'শো পাউণ্ড প্রাপ্তিযোগের কথাটা বার বার ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো। তিনি এবারে আবার নতুন করে আশান্বিত হলেন। ভাবলেন, যদি কপালে লেগে যায়। সেইজন্যে

তিনি বিশেষ নজর দিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, লোকটা সুন্দর পোষাকে সজ্জিত এবং সিল্কের একটা ঝকঝকে টুপি পরা। লোকটা তিনবার বাড়ীর গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। একটু চিন্তা করলো এবং তিনবারই পিছিয়ে গেল। চতুর্থবারে সে তার হাতটা দরজার ওপর রাখলো এবং হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা খুলে বাগানের পথটুকু জোরে জোরে হেঁটে আসতে লাগলো। মিসেস্ সেটা দেখে দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। এবং আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলেন। আগন্তুক ভেতরে এসে মিসেস্ হোয়াইটের দিকে ভাল করে তাকালেন এবং ঘরখানা ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ হোয়াইটের দিকে নজর রাখলেন। মিসেস্ হোয়াইট তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন। লোকটি কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। এবং বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর বললোঃ আমি "ম এ্যাণ্ড মেগিন্স্ কোঃ" থেকে আসছি। তাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন।

কথা শুনে মিসেস্ হোয়াইট্ এক নিশ্বাসে বললেনঃ কে? কী জন্যে? সেখানে কি কিছু ঘটেছে? হারবার্টের কি কিছু হয়েছে? কী হয়েছে আপনি বলুন।

মিঃ হোয়াইট্ তখন তাঁর স্ত্রীর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে আগন্তুককে বললেন, ইনি হারবার্টের মা। আপনি সুস্থ হয়ে বসে ব্যাপারটা ভাল করে খুলে বলুন। দু'কথায় শেষ করে দেবেন না। আমি জানি আপনি অশুভ কোন সংবাদ বহন করে আনেন নি।

আগন্তুক বললেনঃ আমি দুঃখিত।

মিসেস্ হোয়াইট্ বললেনঃ আমার ছেলে কী কোন আঘাত পেয়েছে?

আগন্তুক ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেনঃ গুরুতর আঘাত। পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেনঃ তবে সে কোন ব্যথা অনুভব করে নি।

মিসেস্ হোয়াইট্ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেনঃ ভগবানকে ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

তিনি শেষ বারের মত 'ধন্যবাদ' কথাটা বলবার সময়, তাঁর স্বামী এবং

আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে আসল সত্য বুঝতে পারলেন। আগন্তুকের কথার মর্ম উপলব্ধি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। হাত-পা কাঁপতে লাগলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাতটা স্বামীর গায়ে রেখে বসে পড়লেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

সমস্ত ঘরে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে নীচু গলায় বললো : হারবার্ট একটা বিরাট যন্ত্রে আট্‌কে গিয়েছিল।

মিঃ হোয়াইট্ চোখ তুলে বললেন : মেসিনে আটকে গিয়েছিল?

: হ্যাঁ!

মিঃ হোয়াইট্ তখন জানলা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং স্ত্রীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিচ্ছিলেন। চল্লিশ বছর আগে বিবাহের প্রথম জীবনে যা' তিনি করেছেন। কিন্তু এখন স্ত্রীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নিজের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করছিলেন এবং মনে সাহস ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন। শেষে তিনি আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : আমাদের একমাত্র ছেলে। কাজেই সহ্য করা কঠিন।

আগন্তুক আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবং গলাটা ভাল করে পরিষ্কার করে বললো : আপনাদের এই বিরাট ক্ষতির জন্যে কোম্পানি আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমি আমার কোম্পানির আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র এবং তাঁদের হুকুম তামিল করতেই এখানে এসেছি। আমি নিরুপায়।

আগন্তুকের এই কথার, কেউ কোন জবাব দিল না। মিসেস্ হোয়াইটের চোখ ফ্যাকাসে। করুণ। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। মিঃ হোয়াইটের তখন তাঁর বন্ধু মরিসের প্রথম ইচ্ছার কথা মনে পড়লো। বানরের থাবার গল্প বলতে গিয়ে সে যা বলেছিল।

আগন্তুক পুনরায় বললো : আমাদের কোম্পানি বলে পাঠিয়েছেন যে, তাঁরা আর কোন দায়িত্ব দাবী করছেন না। কোন ঋণ ও স্বীকার করছেন

না। উপরন্তু আপনাদের পুত্রের কৃত-কর্মের জন্যে কোম্পানি ক্ষতি স্বরূপ কিছু সাহায্য দিতে চায়।

মিঃ হোয়াইট্ বললেন : কত ?

: দু'শো পাউণ্ড।

মিসেস্ হোয়াইটের মুখটা অসাড় হয়ে এলো। মিঃ হোয়াইট্ একটা শুকনো হাসি হেসে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বাড়ী থেকে দু'মাইল দূরে একটা নতুন গোরস্থানে মিঃ হোয়াইট্ এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের একমাত্র পুত্রকে কবর দিলেন। এবং অত্যন্ত ধীর পায়ে বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ীতে একটা নীরবতা নেমে এলো। একটা শোকাচ্ছন্নতা ঐ বাড়ীটাকে দীর্ঘদিন ঘিরে থাকলো। এই ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটলো যে তারা প্রথমে ভাল করে উপলব্ধি করতে পারলেন না। ভাবতে পারলেন না যে তাদের জীবনে কি ঘটলো। যতদিন যেতে লাগলো, তত যেন সেই দুঃখের ভার, তাঁদের স্থায়ীভাবে ঘিরে ধরতে লাগলো। এবং একটা উদাসীনতা ও ভগ্নহৃদয় করে তুলতে লাগলো। এখন তাঁরা দু'জনে একই ঘরে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকেন। কিন্তু কোন কথা বলতে পারেন না। তাঁরা জানেন যে আর বলবার মত কিছু নেই। একটা দীর্ঘ ক্লান্তিতে তাঁদের দিন কাটতে লাগলো।

ছেলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে একদিন অনেক রাত্রে একটা চাপা কান্নার আওয়াজে বৃদ্ধ হোয়াইটের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী বিছানায় নেই। ঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার। তিনি ঐ অন্ধকারে কান্নার আওয়াজটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে বুঝলেন যে চাপা কান্নার আওয়াজটা সামনের ঐ জানালার কাছ থেকেই আসছে। তাঁর স্ত্রী একাকী ওখানে দাঁড়িয়ে। তিনি বিছানায় উঠে বসে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা অনুভব করে কাছে ডাকলেন। তাঁর স্ত্রী তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে চাপা কান্নায় ভরিয়ে দিতে লাগলেন। মিঃ হোয়াইট্ বললেন : এদিকে এসো। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী জোরে কেঁদে উঠে বললেন: বাইরে আমার ছেলের আরো বেশী ঠাণ্ডা লাগছে।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ হোয়াইট্ আরো জোরে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল পরতে লাগলো। তিনি ঐ জানালায় একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিঃ হোয়াইটের চোখে তখনো ঘুম জড়িয়ে। তিনি আরো দু'একবার স্ত্রীকে ডেকে কাছে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষে নিজেই বিছানায় আশ্রয় নিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর একটা অদ্ভুত ধরণের কান্নার আওয়াজে তিনি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন।

তাঁর স্ত্রী পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটে এসে বললেন: সেই বানরের থাবা? সেই বানরের থাবার ছাপটা কোথায়?

মিঃ হোয়াইট্ অত্যন্ত অবাক এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: কেন? কী হয়েছে?

: আমি ওটা চাই। তুমি ওটা নষ্ট করে ফেলনি ত'?

: না। ওটা আমাদের বসবার ঘরের ব্রাকেটে ঝোলান আছে। কিন্তু কেন?

মিসেস্ হোয়াইট্ কাঁদতে কাঁদতে বললেন: ওটার কথা আমার এই মাত্র মনে পড়লো। আমার কেন যে আগে মনে পড়ে নি। তোমারও তো মনে পড়তে পারতো?

: কিন্তু ওটা দিয়ে কি হবে? মিঃ হোয়াইট্ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

মিসেস্ হোয়াইট্ বললেন: আরো দু'টো ইচ্ছার কথা আমরা জানাতে পারি। আমাদের আরো দু'টো ইচ্ছা পাওনা আছে। আমরা একটি মাত্র পেয়েছি।

: কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট নয়?

: না। আমাদের আরো একটি ইচ্ছা চাইতে হবে। ওঠো! ওঠো! তাড়াতাড়ি নীচে চলো। এবারে চাইবে, আমাদের ছেলে যেন আবার বেঁচে উঠে।

মিঃ হোয়াইট্ তাঁর বিছানায় উঠে বসে, গায়ের চাদরটা হাঁটু পর্যন্ত নামাতে নামাতে বললেন : তুমি কি পাগল হলে ?

: না। না। তুমি ওঠো। তুমি তাড়াতাড়ি ওঠো। আমার একমাত্র ছেলে —

মিঃ হোয়াইট্ বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জ্বেলে একটি বাতি ধরালেন। তারপর নরম গলায় বললেন : এখন যাও। শুয়ে পড়। তুমি কি চাইছো তা' তুমি নিজেই জানো না।

বৃদ্ধা মহিলা কাঁপতে কাঁপতে বললেন : আমাদের প্রথম ইচ্ছার ফল ফলেছে। তা'হলে দ্বিতীয়টি কেন ফলবে না।

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথা শুনে আপন মনে বিড় বিড় করে বললেন : ওটা একটা পারস্পারিক ঘটনা। হঠাৎ ঘটে গেছে।

: না। না। তুমি চলো। তুমি আবার চাইবে। ভদ্রমহিলা এবারে যেন বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বললেন। এবং স্বামীকে টানতে টানতে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলেন।

স্বামী বেচারা আর কি করবেন। তিনি ঐ অন্ধকার সিঁড়ি হাত্ড়ে হাত্ড়ে নীচের ঘরে এলেন এবং একটা ঢাকনার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওখানেই বানরের থাবার ছাপটি রাখা ছিল। তিনি সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁর ছেলের সেই রক্তাক্ত দেহটির কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ে তিনি শিউরে উঠলেন। তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। তিনি তাড়াতাড়ি ওটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দরজা ভুল করলেন। পরে বেশ কয়েকটা চেয়ার-টেবিল ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ঘর ছেড়ে একটা টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দাটা ভয়ানক অন্ধকার। তিনি সেই অশুভ একটা জিনিষ হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ করে করে ওপরের ঘরে এলেন।

ওপরের ঘরে এসে দাঁড়াতেই, প্রথম তাঁর স্ত্রীর দিকে নজর পড়লো। তিনি দেখলেন তাঁর স্ত্রী কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে। যে চোখে নতুন এক আশার আলো জ্বলছে। তিনি সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রীকে দেখে ভয় পেলেন।

তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতেই স্ত্রী জোর গলায় বললেন : নাও। চাও।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন : আমাদের এই চাওয়াটা খুবই অন্যায় হবে। বোকামীও হতে পারে। মানে আমরা আবার নতুন কোন বিপদেও পড়ে যেতে পারি।

: না। না। তুমি চাও। আমি বলছি তুমি চাও। ভদ্রমহিলা শেষবারে আরো জোর দিয়ে কথাটা বললেন।

ভদ্রলোক তখন আর কোন উপায় না দেখে, অসহায়ের মত তাঁর ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে বললেন : আমাদের ছেলে যেন আবার বেঁচে ওঠে। এটাই এখন আমাদের ইচ্ছা।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে ঐ কাগজখানা নীচে পড়ে গেল। তিনি সেটার দিকে একবার তাকালেন। এবং কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এখনি শুভ কিছু একটা ঘটবে। এবং তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হবার আভাষ তিনি পাবেন।

ধীরে ধীরে ঘরের বাতিটা নিভু নিভু হয়ে এলো। তাঁদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে দেওয়ালে পড়তে পড়তে শেষে সরে গেল। বাতিটা নিভে গেল এবং ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

ভদ্রলোক ভাবলেন যাক! বাঁচা গেল। ঐ কাগজখানার আর কোন শক্তি নেই। এখন আমাদের ইচ্ছা আর কার্যাকরী হবে না। তিনি নিশ্চিন্ত মনে গুটি গুটি নিজের বিছানায় এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর স্ত্রীও আর কোন কথা না বলে অত্যন্ত ধীর পায়ে তাঁর পাশে এসে বসলেন। তখন দু'জনেই নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। নিস্তব্ধ ঘরখানায় শুধু দেওয়াল-খড়ির টিক্ টিক্ শব্দটা কানে বাজতে লাগলো।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটলো। হঠাৎ একটা ইঁদুর ঐ নীরবতার মধ্যে একটা ছোট্ট শব্দ তুলে দেওয়ালের আশ-পাশ দিয়ে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর, ভদ্রলোকের সাহস একটু বাড়লো। তিনি একটি দেশলাই জেলে সেই আলোতে পথ করে করে আরেকটা বাতি আনবার জন্যে নীচে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেশ্‌লাইটা হঠাৎ নিভে গেল। তিনি সেই অন্ধকারে আবার একটা দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং ঠিক সেই মুহুর্তেই বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

শব্দটা কানে আসতেই তাঁর হাত থেকে দেশ্‌লাই-এর বাক্সটা নীচে পড়ে গেল। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। তিনি আবার কড়া নাড়ার শব্দ পেলেন এবং ভয়ে এক দৌড়ে ওপরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। শব্দটা তৃতীয় বারে সমস্ত বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়লো।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন ঃ ওটা কিসের শব্দ?

ঃ ইঁদুরের। ভদ্রলোক কাঁপা গলায় বললেন ঃ ইঁদুরের। সিঁড়ির মুখে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

ভদ্রমহিলা বিছানায় বসে শব্দটা শুনতে লাগলেন। শেষবারের মত ঐ শব্দটা জোরে জোরে সারা বাড়ীতে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

মিসেস্ হোয়াইট্ লাফিয়ে উঠে বললেন ঃ হারবার্ট! ঐ যে হারবার্ট! তিনি দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলে বললেন ঃ কোথায় যাচ্ছ?

ঃ আমার ছেলে। আমার হারবার্ট এসেছে। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, আমাকে বাধা দিও না। আমাকে যেতে দাও। যেতে দাও। তিনি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি দরজা খুলবোই।

ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঃ ভগবানের দোহাই। তুমি দরজা খুলো না।

ঃ তুমি তোমার নিজের ছেলেকে ভয় পাচ্ছ? আমাকে ছেড়ে দাও। ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বললেন ঃ হারবার্ট আমি আসছি। আমি আসছি।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এবারে প্রচণ্ড জোরে।

বৃদ্ধা মহিলা জোর করে স্বামীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক ও পিছু পিছু দৌড়োলেন। স্ত্রীকে বার বার নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ। বৃদ্ধা মহিলা স্বামীর কথা না শুনে, ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতে লাগলেন।

ভদ্রলোক সিড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী ঝোলান কোটের পকেট থেকে চাবিটা বার করে তাঁকে ডাকছেন ঃ তাড়াতাড়ি এসো। তালাটা ওপরে। আমি খুলতে পারবো না।

মিসেস্ হোয়াইট্ হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভয়ানক ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিলো। ভদ্রলোকের মাথায় তখন হঠাৎ বানরের থাবার কথাটা এসে গেল। তিনি তাঁর স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে, ঐ ঘরের মধ্যে বানরের থাবার ছবিটা হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন বাতাসে ওটা বাইরে চলে গিয়ে না থাকে। ওটা ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর একান্ত প্রয়োজন।

বাইরে আবার কড়া নাড়ায় শব্দ পাওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী একটি চেয়ার টানতে টানতে ঐ দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে, তারই সাহায্যে তালা খোলার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনি, তিনি বানরের থাবার ছাপটা হাতের সামনে পেয়ে গেলেন। তিনি সেটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসে তাঁর তৃতীয় এবং শেষ ইচ্ছাটি জ্ঞাপন করে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছাটি চাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ থেমে গেল। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি তখনো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাঁর স্ত্রী অনেক কষ্টে বাইরের দরজা খুললেন। একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া সেই ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। বাইরে ফাঁকা অন্ধকার। তিনি তাঁর স্ত্রীকে গভীর হতাশায় এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখলেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখে তিনি বুকে সাহস পেয়ে তাঁর স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিসেস্ হোয়াইট্ বাইরেটা ভাল করে দেখে, ছুটে বাগানের গেট্ পর্যন্ত এলেন। দেখা গেল, রাস্তার আলোটি নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। রাস্তা শূন্য। সেখানে কেউ নেই।

জেমস্ ফেনীমোর কুপার

[জেমস্ ফেনীমোর কুপারের জন্ম ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। কুপার যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মার্কিনী সাহিত্য বলে তেমন কিছু ছিল না। সেই সময় তিনি এবং আরো কয়েকজন লেখক মার্কিনী সাহিত্যের ভাবনা গড়ে তোলেন।

কুপার অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে যে সব বইতে তিনি রেড-ইণ্ডিয়ান ও নাবিকদের জীবন যাত্রার কথা প্রকাশ করেছেন, সেই বই গুলোই জনসমাজে আজো আদৃত হয়ে আছে। "দি লাষ্ট অব দি মোহি কান্স" কুপারের সব চেয়ে জনপ্রিয় বই। এটি প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। এই পুস্তকেও তিনি রেড-ইণ্ডিয়ান ও শ্বেতকায়দের যুদ্ধের কথা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সব পুস্তক পাঠ করলে বোঝা যায় যে, তিনি আমেরিকার আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও দরদী ছিলেন।]

জেমস্ ফেনীমোর কুপার | রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রতিশোধ

জেনারেল ওয়েব, সামনের কাগজখানা সই করে উঠে দাঁড়ালেন। যে কাগজখানা তিনি সই করলেন, সেটা তরুণ ইংরেজ ডানকান হেওয়ার্ডের বিদায় পত্র। তিনি এ বাহিনীর মেজর। এবং আজকে বিদায় নিচ্ছেন।

তাঁর পাশেই দু'জন তরুণী, কোরা এবং অ্যালিস্ নতমুখে দাঁড়িয়ে। এরা কর্ণেল মনরোর দুই কন্যা। এরা মেজর হেওয়ার্ডের সঙ্গে উইলিয়াম হেনরির ফোর্টে যাবে। সেইজন্যে জেনারেলের কাছে এরাও শেষ বিদায়ের জন্যে দাঁড়িয়ে। উইলিয়াম হেনরি ফোর্টের বর্তমান দায়িত্বে আছেন কর্ণেল মনরো।

শেষ বিদায়ের পত্রখানা ডানকান হেওয়ার্ডের হাতে দিয়ে, জেনারেল ওয়েব গম্ভীর হয়ে বললেন : মেজর হেওয়ার্ড! কর্ণেল মনরোর কাছে তাঁর দুই কন্যাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হল। খুব সাবধানে পথ চলবেন। এখানে বনের পথ কি পরিমান ভয়াবহ, সেটা আপনি

জানেন। এই ভীষণ পথ পার করে আপনি ওদের নিয়ে যেতে পারবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। সেইজন্যে এ দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়েছি। যদি সম্ভব হয় তবে তাড়াতাড়ি ওদের কর্ণেল মনরোর কাছে পেঁীছে দেবেন। কারণ কর্ণেল মনরো এদের জন্যে খুবই চিন্তিত আছেন। আপনি আমার কথার গুরুত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এর বেশী আমার বলবার আর কিছু নেই।

মেজর হেওয়ার্ড জেনারেল ওয়েবের কথাগুলো ভালকরে শুনে বললেন : আমার ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন। পথে যত বিপদই আসুক, আমি আমার জীবন দিয়ে ওদের রক্ষা করবো এবং কর্ণেলের কাছে পেঁীছে দেব।

এরপর মেজর হেওয়ার্ড জেনারেল, ওয়েবের কাছে বিদায় নিলেন এবং তিনজন তিনটে ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করলেন।

এদের যাত্রার আগে এক ফৌজী বাহিনীও যাত্রা করলো। তাদের যাত্রাপথ ও উইলিয়াম হেনরি ফোর্টে। এঁরা যাবেন বড় রাস্তা ধরে ঘুর পথে। কিন্তু মেজর হেওয়ার্ড বনের মধ্যে দিয়ে সোজা পথে ওদের নিয়ে যেতে চাইছেন। তার কারণ কর্ণেল মনরোর কন্যাদের তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পেঁীছে দিতে চান। উপরন্তু পথের ধূলোবালি এবং পরিশ্রমটাও কম। মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা সহজ হবে। সেইজন্যে তিনি ঠিক করেছেন যে, অকারণ ঘুর পথে না গিয়ে, সোজা পথ ধরেই যাবেন। যদিও বনের মধ্যে পথ চলার তেমন ভাল রাস্তা নেই। এবং তিনি এ পথটাও ভাল চেনেন না।

কিন্তু তারজন্যে ভাবনার কিছু আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ উইলিয়াম হেনরি ফোর্ট থেকে যিনি এসেছেন, তিনি এ পথের সব কিছুই জানেন। তিনি একজন রেড-ইণ্ডিয়ান সংবাদ বাহক। তিনি মেজর হেওয়ার্ডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। মেজর হেওয়ার্ড ভাল করেই জানেন যে, এই সব রেড-ইণ্ডিয়ান সংবাদ বাহকেরা এ বনপথ এবং জঙ্গলের পথ-ঘাট সব কিছুই জানেন। সুতরাং ভয়ের আর কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি শুনেছেন যে, এ বনপথে একটি ছোট্ট

নিরাপদ ভাল রাস্তা আছে। সে পথে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। সংবাদ-বাহকটি সেই পথ ধরেই তাঁকে এবং কর্ণেল মনরোর কন্যাদের নিয়ে যাবেন।

যে রেড-ইণ্ডিয়ান সংবাদ বাহকটি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর নাম ম্যাগুয়া। তাঁর শরীর দেখলে কোন মানুষের বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তি। একজন দক্ষ ভাস্কর্যের কৃতিত্ব। লম্বা-চওড়ায় এমন চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। যেমন জোয়ান, তেমনই দুঃসাহসী। পরনে লোমওলা চামড়ার পোষাক। মাথা কামানো, তবে সেই মাথায় মস্ত বড় একটা টিকি ঝুলছে। সেই টিকিতে বাজ পাখীর পালক। অন্যান্য রেড-ইণ্ডিয়ানদের মত তার ও কোমরে একখানা ধারালো ছুরি ঝুলছে। এবং হাতে একখানা কুড়োল। এই দু'খানা অস্ত্রই যে কোন শত্রুকে সাম্‌লাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কর্ণেল মনরোর একটি মেয়ে কোরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই রেড-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-বাহকটিকে দেখছিল। সে বললেঃ লোকটা দেখতে কি বিশ্রী। মেজর হেওয়ার্ড তখনই তাকে হাত-ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ চুপকর কোরা। লোকটা তোমার কথা শুনতে পাবেন। ওর নাম ম্যাগুয়া। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কর্ণেল মনরোর আরেকটি মেয়ে অ্যালিস্ সেখানে দাঁড়িয়ে সে কথা শুনছিল। সে মন্তব্য করলোঃ এই অসভ্য লোকটার সঙ্গে এত পথ পাড়ি দিতে আমার ভীষণ ভয় করবে।

মেজর হেওয়ার্ড বললেনঃ ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তোমাদের বাবা তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেই পাঠিয়েছেন। অবিশ্বাসী হলে নিশ্চয়ই পাঠাতেন না। এ ছাড়াও আমাদের হুকুম যদি সে না মানে, তা'হলে কি ভীষণ শাস্তি তাকে পেতে হবে, সেটা সে ভাল করেই জানে। আর এ শাস্তি দেবেন স্বয়ং কর্ণেল মনরো। সুতরাং এঁকে আমরা অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারি।

তবুও অ্যালিস্ বললোঃ তা'হলেও লোকটার চেহারা দেখে আমার কিন্তু একটুও বিশ্বাস আসছে না। আমার মনে হচ্ছে লোকটা শেষ পর্যন্ত ঐ

বনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা না করে বসে। তা'হলে আমরা খুবই বিপদে পড়বো।

কথা শুনে মেজর হেওয়ার্ড আবার বললেন ঃ না। না। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মনে রেখো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তোমাদের বাবাই ওঁকে পাঠিয়েছেন। আমরা ওঁকে বিশ্বাস করতে পারি।

সামনের বড় রাস্তা ধরে পথ চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছিলো। ম্যাগুয়া মাথা নীচু করে আগে আগে। এবারে সামনেই ঘন বন।

ম্যাগুয়া ওঁদের থামিয়ে দিয়ে বললো ঃ এবারে আমাদের বনের পথ ধরতে হবে। সামনেই ঘন বন। আমরা এই পথেই এগুবো।

ম্যাগুয়ার কথা শুনেই কোরা আর অ্যালিসের মুখে অন্ধকার নেমে এলো। মেজর হেওয়ার্ড ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলেন। এতক্ষণ কিন্তু করেন নি। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করবেন। বনের পথ ধরলে তাড়াতাড়ি হবে এ কথা সত্য। কিন্তু দায়িত্ব অনেক। আর যদি সোজা বড় রাস্তা ধরে যাওয়া যায়, তবে দেরি হবে এ কথা সত্যি। কিন্তু কোন রকম দায়িত্ব থাকে না। একটু আগেই মূল ফৌজী বাহিনী রয়েছে। এখনো তাদের ধরে ফেলা অসম্ভব কিন্তু নয়। সুতরাং আশঙ্কার কিছু থাকে না।

কিন্তু পরক্ষণেই মেজর হেওয়ার্ড ভাবলেন, এ কাজটা করলে সকলের সামনে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তিনি এদের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। এ কথা মনে হতেই, তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঃ এই সামনের বনে ঢুকতে হবে বুঝি ? বেশ চলো।

অ্যালিস্ চুপি চুপি বললো : এই ভীষণ বনে আমাদের ঢুকতে হবে। আমার ভয় করছে।

মেজর বললেন : আমি আছি। এ পথে গেলে সময় কম লাগবে।

কোরা বললো : ভয় পাবার কিছু নেই। চলো এগিয়ে যাওয়া যাক। আসলে আমরা রেড-ইণ্ডিয়ানদের লাল চামড়াকেই ভয় করি। চামড়াটা লাল না হ'লে আমরা ভয় পেতাম না। আমরা ওঁকে স্বাভাবিক ভাবেই নিতাম।

অ্যালিস্ বললো ঃ তা'হলে চলো।

ওঁরা বনের সরু পথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলেন। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, বন আরো ঘন হয়ে এলো। এখানে ঝোপঝাড়, গাছের ডালপালা আর বন্য গাছ-গাছালী এমন জড়িয়ে আছে যে, সূর্যের আলোতেও পথ অন্ধকার হয়ে আছে। চলা প্রায় অসম্ভব। পথ এত সংকীর্ণ যে পাশাপাশি দু'জন চলা যায় না। আগু-পিছু চলতে হয়। এখানে গাছ-গাছালীর আরো ভীড়। গায়ে এসে লাগে।

এই ভাবে আরো কিছু পথ পার হবার পর, সামনে গভীর অরণ্য দেখা গেল। ওঁরা চমকে দাঁড়ালেন। ম্যাগুয়া বললো ঃ ভয় পাবেন না। এগিয়ে চলুন।

ওঁরা আবার এগুতে লাগলেন। কোরা এবং অ্যালিসের চোখে-মুখে ভয়। মেজরের মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন পেছন দিক থেকে বিদ্যুৎ বেগে এদিকেই আসছে। ভয়ে অ্যালিসের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কোরার দিকে তাকালো। কোরা অ্যালিসের দিকে। মেজর হেওয়ার্ড ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ ঘোড়া থামাও। পেছন দিক থেকে কেউ একজন এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

অ্যালিস এবং কোরা ঘোড়া থামালো। পেছনের অশ্বারোহী সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে মেজর হেওয়ার্ড আপন মনেই বলে উঠলেন ঃ ইংরেজ দেখছি। পরে তিনি অশ্বারোহীকে বললেন ঃ আপনি কে? এই ঘন বনে কেমন করে এলেন? কি দরকার বলুন।

অশ্বারোহী বললেন ঃ আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করতে আসি নি। পথে শুনতে পেলাম যে আপনারা উইলিয়াম হেনরি ফোর্টে যাচ্ছেন। আমিও সেখানেই যাব। আপনাদের অসুবিধা না থাকলে যদি আমাকে সঙ্গে নেন।

মেজর হেওয়ার্ড বললেন ঃ না। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত।

অশ্বারোহী, মেজরের কাছে এমন জবাব আশা করেন নি। তিনি বেশ অপমানিত বোধ করলেন।

তখন অ্যালিস চুপি চুপি মেজরকে বললো: ভদ্রলোক যখন ইংরেজ তখন আমাদের সঙ্গে আসতে অসুবিধা কি? উনি এলে আমাদের দলে কিছুটা লোকের সংখ্যা বাড়বে।

মেজর তখন চিন্তা করে অশ্বারোহীকে বললেন: আপনার নাম বা পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নেই।

অশ্বারোহী তখন বললেন: আমার নাম ডেভিড্ গ্যামুট। ভগবানের নাম-গান করে বেড়ানোই আমার কাজ। আমি কোন ঝামেলা পছন্দ করি না। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনারা কোন বিপদে পড়বেন না।

মেজর তখন লোকটির চেহারার দিকে ভাল করে তাকালেন। লোকটি রোগা। লম্বা। হাত-পা গুলো কেমন যেন বেয়াড়া। সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। না বন্দুকটি পর্যন্ত। শুধু, হাতে আছে মাত্র একটা বাজনা।

লোকটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে মেজর তাকে তাঁদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন।

মেজর এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কোরার সঙ্গে আগে আগে চলতে লাগলেন। পেছনে অ্যালিস এবং গ্যামুট। গ্যামুট অ্যালিসকে খুশি রাখবার জন্যে ঐ নির্জন বনে গান গাইতে শুরু করলো। অ্যালিস ওর কাণ্ড দেখে অবাক। এমন অদ্ভুত মানুষ সে জীবনে দেখেনি।

ম্যাগুয়া এতক্ষণ ধরে এই সব ঘটনা এক মনে লক্ষ্য করছিল। এবারে সে গ্যামুটের গান শুনে বিরক্ত হয়ে মেজরকে বললো: এমন চিৎকার করলে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আপনি ঐ লোকটাকে থামতে বলুন। এটা গান গাইবার জায়গা নয় বা সময় ও নয়।

মেজর গ্যামুটকে থামতে বললেন। গ্যামুট সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

এরপর এই দল বেশ কয়েক ঘণ্টা ভালভাবে পথ চলতে লাগলো। অনেকটা পথ এগিয়েও এলো। তারপর বনের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

নির্জন রাতে ঐ অরণ্য ধীরে ধীরে ঢাকা পড়তে লাগলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। ওরা তখনো চলেছে।

মেজর এবারে চিন্তিত হলেন। কোরা এবং অ্যালিস্ দীর্ঘ পথ-শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এবারে যেন বিশ্রাম পেলে ভাল হয়।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত ম্যাগুয়া ঐ গভীর অরণ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো: আমি যদিও আপনাদের পথ-প্রদর্শক, তবুও আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি পথ ভুল করে ফেলেছি। আমরা অন্যপথে চলে এসেছি।

ম্যাগুয়ার কথা শুনে চমকে উঠলেন মেজর হেওয়ার্ড। তিনি ভাবলেন লোকটা শত্রুতা করবে নাকি।

কোরা এবং অ্যালিস ভয়ে মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: আমাদের ঘুরে যাওয়াই উচিত ছিল। সঙ্গে ফৌজী বাহিনী থাকতো।

মেজর সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি তীব্র নজরে ম্যাগুয়াকে দেখতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। আর সেই সঙ্গে ওঁদের মধ্যে ভয় ও অস্বস্তি দেখা দিতে লাগলো।

সামনেই একটা পাহাড়ী নদী। ছল-ছলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আঁকা বাঁকা তার পথ। এই গভীর অরণ্যে এ অঞ্চলটা একটু হালকা। বিকেলের শেষ আলো অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। গভীর অন্ধকার ধীরে ধীরে এই নির্জন অরণ্যে জায়গা করে নিচ্ছে। চারিদিকে চুপচাপ। একটানা নীরবতায় ভরা।

সেই নদীর তীরে গা এলিয়ে বসেছিলো অপর দু'জন ব্যক্তি। একজন রেড-ইণ্ডিয়ান চিন্‌গাচ্‌গুক। অপরজন খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু রোদে পুড়ে পুড়ে গাঁয়ের রং তামাটে। পরণে শিকারীর পোষাক। রেড-ইণ্ডিয়ানরা এর নাম দিয়েছে 'হক্‌-আই'। অর্থাৎ বাজপাখীর চোখ। 'হক্‌-আই' একজন আমেরিকান স্কাউট্। অত্যন্ত সৎ। এই দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ নেই। শিকার করা তার নেশা এবং পেশা। যত্র-তত্র আহার এবং

বিহার। থাকবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। এ অঞ্চলে সমস্ত জায়গা তার জানা। সে, এ অঞ্চলে বার বার ঘুরেছে এবং শিকার করে বেড়িয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাকে এক ডাকে চেনে। এই চেনার একমাত্র কারণ হল অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ। সকলেই জানে যে তার নিশানা কখনো ব্যর্থ হয় না বা হবে না। এমনকি তার শত্রু ফরাসীরাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে কিন্তু এ সব ঘটনার নীরব দর্শক এবং শত বিপদেও নির্ব্বিকার।

এই 'হক্-আই' এর বন্ধু চিন্‌গাচ্‌গুক্ ও 'হক-আই' এর মত। তিনকূলে আপনজন বলতে কেউ নেই। একমাত্র একটি ছেলে ছাড়া। ছেলেটিও বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর শিকার করে। 'হক্ আই ছেলেটিকে খুব ভালবাসে। নিজের হাতে শিকার শিখিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন এই ছেলে, এই অঞ্চলে চিন্‌গাচ্‌গুক ও 'হক-আই-এর নাম রাখবে।

নির্জ্জন রাতে নদীর কূলে বসে দুই বন্ধুতে জোর গল্প চলছিলো। চিন্‌গাচ্‌গুক বলছিলো ডেলাওয়ার তাদের জাতভাই। এরাই রোকয়দের হটিয়ে দিয়ে মিসিসিপি নদী থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পরে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হার মানতে হয়েছে। বন্দুকের সামনে তীর ধনুকের লড়াই চলেনা। ফলে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। চিন্‌গাচ্‌গুক আরো বললোঃ আমার পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন। সেইজন্যে এ অঞ্চলের লোকেরা আজো আমাকে সর্দার বলে ডাকে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। তাই আজ আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার ছেলে আংকাম্ ডেলাওয়ার রাজবংশের মোহিকানদের শেষ বীর এবং বংশধর। আমার ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোহিকানদের বংশ শেষ হয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতা থেকে এ নাম চিরদিনের জন্যে মুছে যাবে।

হক্-আই এ সব কথা শুনলো বটে তবে কোন জবাব দিল না। তার জবাব দেবার কিছুই নেই। সে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললোঃ আচ্ছা, আংকাম আসছে না কেন? এত দেরী তো সে কখনো করে না।

আংকামের নাম করতে করতেই আংকাম পাশে এসে দাঁড়ালো। দীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা। কাঁধে একটি মৃত হরিণ। হক্-আই সেদিকে তাকিয়ে বললো : আজকে ভোজটা ভালই হবে দেখছি। হরিণটা ভালই পেয়েছ।

আংকাম তার কাঁধ থেকে মৃত হরিণটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বললো : আসবার পথে বনের মধ্যে কিছু ইরোকয়কে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। আমার মনে হয় ওরা কোন মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আংকামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা আওয়াজ শোনা গেল। একটা অস্পষ্ট শব্দ। চিন্‌গাচ্‌গুক তাড়াতাড়ি মাটিতে কান পেতে সে শব্দ ভাল করে শুনে বললো : ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হক্-আই তুমি তৈরী হয়ে নাও। বিপদ আসছে।

হক্-আই নিজেকে সতর্ক করে বনের পথের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে সে এখন প্রস্তুত।

কিছুক্ষণ পর বনের মধ্যে থেকে ঘোড়ায় চেপে যাঁরা বেরিয়ে এলেন, তাঁরা হচ্ছেন ডেভিড্ গ্যামুক এবং ডানকান হেওয়ার্ড।

হেওয়ার্ড ঘোড়া থেকে নেমে বসে পড়লেন। এত পরিশ্রান্ত তিনি জীবনে হননি। তিনি বসে পড়েই হক্-আইকে বললেন : আমরা এই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলছি। গোলোক ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। সেইজন্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।

হক্-আই অবাক চোখে প্রশ্ন করলো : সেকি! আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আর যাবেনই বা কোথায়?

ডানকান হেওয়ার্ড বললেন : আমরা উইলিয়াম হেনরি কোর্টে যাব। এওয়ার্ড কোর্ট থেকে আসছি। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিয়েছে একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে। যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলো।

হক্ আই বললো : কেন? কি ব্যাপার?

হেওয়ার্ড বললেন : লোকটা এখন আমাদের বলছে যে, সে নাকি পথ ভুল করে ফেলেছে। এখন আমরা কি করি বলুন। সঙ্গে আমার দু'জন মহিলা আছেন।

হক্-আই খুব আশ্চর্য হয়ে বললো: কিন্তু এমন তো হতে পারে না। এই বনের সমস্ত পথ, সমস্ত জায়গা রেড-ইণ্ডিয়ানদের নখ দর্পনে। তারা এ পথ ভুল করতে পারে না। উইলিয়াম হেনরি কোর্ট এ অঞ্চলের একেবারে বিপরীত দিকে। আপনারা সম্পূর্ণ উলটো পথে এসে পড়েছেন।

হেওয়ার্ড তখন একটু ভীত হয়ে বললেন: এখন আমরা কী করতে পারি?

হক্-আই একটু চিন্তা করে বললো: আপনারা কি লোকটাকে বিশ্বাসী বলে মনে করেন? আপনারা ঠিক জানেন যে, সে শত্রু পক্ষের লোক নয়? কোন মতলব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসছে না?

হেওয়ার্ড বললেন: আপনার এত কথার কোনটাই আমি জবাব দিতে পারবো না। কারণ লোকটাকে আমি চিনি না। তবে সে নিজেকে উইলিয়াম হেনরি কোর্টের লোক বলে পরিচয় দিয়েছে।

হক্-আই সে কথা শুনে অবাক হয়ে বললো: সেকি মশাই। তা'হলে তো বিপদ অনিবার্য। চলুন লোকটাকে দেখে আসি।

হেওয়ার্ড হক্-আইকে ম্যাগুয়ার কাছে নিয়ে এলো। ম্যাগুয়া তখন একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে যে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তার জন্যে তার চোখেমুখে কোন উদ্বেগের ছাপ নেই।

হক্-আই দূর থেকে ম্যাগুয়াকে দেখে বললো: আমার ধারণা ভুল হয় নি। এ লোকটা ইরোকয়দের দলের লোক। আশে-পাশে নিশ্চয়ই এদের কোন ঘাঁটি আছে। লোকটা আপনাদের ঐ ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে চাইছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আট্‌কাতে হবে।

হেওয়ার্ড বললেন: কিন্তু কেমন করে? আমার সঙ্গে কর্ণেল মনরোর দুই কন্যা আছে। সেইজন্যেই আমি বেশী শঙ্কিত হচ্ছি।

হক্-আই বললো: শঙ্কার কোন কারণ নেই। ওদের দল আমাদের আক্রমণ করবার আগেই, আমাদের উচিত ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনারা এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতে থাকুন। ওদিকে চিন্‌গাচ্‌গুক্ ও আংকাম ওকে ঘিরে ধরে আটকে ফেলবে।

হেওয়ার্ড বললেন : বেশ ! আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের ব্যবস্থা নিন।

হেওয়ার্ড আর কথা না বলে, ম্যাগুয়ার কাছে এগিয়ে এসে বললেন : সর্দ্দার ! এবারে আমাদের একটা কিছু বলে দাও। তুমি তো দিব্যি আরামে বসে আছ। কিন্তু আমরা তো এভাবে বসে থাকতে পারি না। ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হয়। আমরা এই বনের মধ্যে একজন শিকারীকে পেয়েছি। তুমি যদি অনুমতি করো তবে আমরা তার সঙ্গেই রওনা হয়ে যাই।

ম্যাগুয়া চোখ তুলে বললো : আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে যেতে পারেন। আপনাদের ছেড়ে দিলাম। আমি এবারে আমার নিজের পথ ধরবো।

হেওয়ার্ড বললেন : নিজের পথ ধরবেন মানে ? নিজের কোন পথ ? কর্ণেল মনরোর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে কি বলবো যে, তুমি তাঁর দুই কন্যাকে জঙ্গলে ফেলে পালিয়েছো ?

: আমি মনরোর কাছে আর ফিরে যাচ্ছি না। আমি আমার নিজের ডেরায় ফিরে যাচ্ছি। ম্যাগুয়া উঠে দাঁড়ালো।

হেওয়ার্ড এখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, ম্যাগুয়ার মতলব অন্য। সে ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছে।

ম্যাগুয়া চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই হেওয়ার্ড তাকে ধরতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। ম্যাগুয়া হেওয়ার্ডকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেওয়ার্ড তখন বেবাক-অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গাছের আড়াল থেকে চিন্‌গাচ্‌গুক আর আংকাম এ ঘটনা লক্ষ্য করছিলো। তারা ছুটে এসে ম্যাগুয়াকে তাড়া করলো। হক্‌-আই ও আর অপেক্ষা না করে ম্যাগুয়াকে লক্ষ্য করে গুলি করলো।

কিন্তু ম্যাগুয়া তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। তবুও চিন্‌গাচগুক ছাড়বার পাত্র নয়। সে আরেকবার গুলি করে ম্যাগুয়াকে ঐ বনের মধ্যে

অনুসরণ করলো এবং হক্ আই-কে বললোঃ তাড়াতাড়ি চলে এসো। ওদের দল এক্ষুনি এসে পড়বে।

হেওয়ার্ড বললেনঃ আপনারা এ ভাবে আমাদের ফেলে চলে যাবেন না। আমাদের সঙ্গে মহিলা আছেন। আপনারাও যদি এই বিপদে আমাদের ত্যাগ করে চলে যান, তবে আমরা কার কাছে আশ্রয় চাইবো।

হক্-আই বললোঃ আপনাদের আমরা সাহায্য করতে পারি একটা শর্তে।

ঃ বলুন কি শর্তে।

ঃ এখন থেকে আমরা যা বলবো করতে হবে। যে জায়গায় নিয়ে যাব যেতে হবে। এবং জায়গার নাম গোপন রাখতে হবে। রাজী থাকেন তো মহিলাদের নিয়ে চলে আসুন। আর দেরি করবেন না।

হেওয়ার্ড রাজী হয়ে গেলেন এবং ওদের অনুসরণ করলেন।

ম্যাগুয়া চলে যাওয়াতে খুবই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ আংকাম বনের মধ্যে যে ইরোকয়দের দেখে এসেছে, ম্যাগুয়া যদি ওদের সঙ্গে মিলতে পারে তবে আক্রমণ অনিবার্য। এ বিপদ এড়ানো যাবে না। সুতরাং যদি এড়াতে হয়, তবে পালাতে হবে। আজকের রাতটা গোপনে কোথাও কাটিয়ে, সকালে দিনের আলোতে উইলিয়াম হেনরি কোর্টের দিকে রওনা হতে হবে।

গোপনে পথ চলতে চলতে হেওয়ার্ড চুপি চুপি কোরা ও অ্যালিসকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে ওরা অত্যন্ত ভীত হল।

হক্-আই চিন্‌গাচ্‌গুক-কে বললোঃ তুমি এঁদের ঘোড়াগুলো ভাল জায়গায় বেঁধে রেখে এসো। দেখবে শত্রুরা যেন জানতে না পারে। আমরা আজকে রাতের মত একটা গোপন জায়গার সন্ধানে এই পাহাড়ী নদী পথে এগুচ্ছি। তোমরা পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও। রাতটা কোন ভাবে কাটাতে পারলে, সকালে যা'হোক কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।

চিন্‌গাচগুক আর আংকাম ঘোড়া নিয়ে হাঁটা পথে যাত্রা করলো। হক-আই সামনের ঝোপ থেকে একটা ডিঙ্গি নৌকা টেনে বার করে সবাইকে তাতে তুলে নিয়ে যাত্রা করলো।

নৌকায় উঠে হেওয়ার্ড, কোরা এবং অ্যালিসের মনে সাহস জোগাবার জন্যে বললেন : তোমরা ভয় পেওনা। এরা খুবই ভাল লোক। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাব।

কোরা বললো : আমরা ভয় পাচ্ছি না। কারণ জানি যে এখানে ভয় পেয়ে কোন ফল হবে না। কপালে যা 'আছে তা' ঘটবেই। সুতরাং আমাদের এখন সাহস সঞ্চয় করতেই হবে।

হক্-আই নৌকা টানতে টানতে বললো : আপনারা আস্তে কথা বলুন। বাতাসের ও কান আছে। আমরা এখনো শত্রুর কবল মুক্ত নই। যে কোন সময়ে বিপদ আসতে পারে।

নৌকা তরতরিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণে পর চিন্‌গাচগুক ও আংকাম এসে হাজির হল। হক-আই বললো : ঘোড়াগুলো ভাল জায়গায় বেঁধে রেখেছ তো? সকালে না পাওয়া গেলে এঁদের যাত্রা করা অসম্ভব হবে।

চিন্‌গাচগুক বললো : ভয়ের কোন কারণ নেই। ওদের খুঁজে বার করা কারো সাধ্য নেই। সকালে ঠিক পাওয়া যাবে।

হক্-আই বললো : আংকাম যে হরিণটা মেরেছে, ওটাকে নিয়ে তোমরা হাঁটা পথে চলে যাও। আমরা নৌকায় যাচ্ছি।

সে কথায় দু'জন মোহিকান সম্মতি জানিয়ে, ঐ বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। এদিকে পাহাড়ী-নদীর স্রোতে নৌকা বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে যেতে লাগলো। কোরা এবং অ্যালিস ভয় পেয়ে বললো : আপনি আস্তে চালান। না হলে আমরা ডুবে যাব।

হক্-আই বললো : ভয় পাবার কিছু নেই। স্রোতের টানটা বেশী। অবশেষে হক্-আই নিজের মনোমত জায়গায় এসে নৌকা বাঁধলো। সামনেই একটা প্রকাণ্ড পাহাড়। এবং তা'তে একটি বড় গুহা। হক্-আই বললো : আজ রাতটা এই গুহাতেই কাটাতে হবে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা আগেই গুহাতে ঢুকবেন না। গুহার সামনে অপেক্ষা করুণ। আমি আসছি।

হক্-আই কথা শেষ করেই আবার নৌকা নিয়ে অন্ধকারে নদীপথে মিলিয়ে গেল। এবং একটু পরে চিন্‌গাচগুক ও আংকামকে নিয়ে ফিরে এলো। এদের চলাফেরা হেওয়ার্ডের কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। সেইজন্যে হেওয়ার্ড বললেনঃ এই জায়গাটা কি রেড্-ইণ্ডিয়ানদের কাছে নিরাপদ বলে আপনি মনে করেন। যদি ওরা দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করে তখন আমরা কি করতে পারি ?

হক্-আই বললোঃ তা'হলে আমরা তার জবাব দিতে পারি। এবং হত্যা করতে পারি। কিন্তু তার দরকার হবে না। এ জায়গা নিরাপদ বলেই আমরা এখানে এলাম।

হক্-আই কথা বলতে বলতে কাঁধ থেকে মৃত হরিণটা নামিয়ে রেখে চিন্‌গাচ্‌গুক ও আংকাম কে নিয়ে আবার ঐ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এদের চলাফেরা হেওয়ার্ড, কোরা এবং অ্যালিসের কাছে ভয়ানক অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। এবং সন্দেহ বাড়তে লাগলো। তবে এ রহস্যের সমাধান হতে খুব বেশী দেরি হল না। হঠাৎ এক পাহাড়ী গুহার মুখের সামনে মশালের আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল। এবং বোঝা গেল যে সেখানে হক্-আই ও আংকাম দাঁড়িয়ে কি যেন করছে।

কিছুক্ষণ পরে হক্-আই এর গলা শোনা গেল। যে বললোঃ আপনারা এই মশালের আলোতে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। শত্রুপক্ষ এই আলো দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই।

হেওয়ার্ড তখনই, কোরা আর অ্যালিস কে নিয়ে সেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আংকাম একটা ভারী চটের মত জিনিষ দিয়ে সেই গুহার মুখ ঢেকে দিল। যা'তে আলোটা বাইরে না যায়। হেওয়ার্ড গুহাতে ঢুকে আর দাঁড়াতে পারলেন না। সারাদিনের ধকলে তিনি খুবই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। তিনি বসে পড়লেন। চিন্‌গাচ্‌গুকের বসে থাকবার সময় সেই। সে কোথা থেকে কিছু ডাল-পালা জোগাড় করে আগুন জ্বেলে ফেললো। তারপর ঐ হরিণটাকে ভাল করে কেটে-কুটে রান্না চাপালো।

সামনে হক্-আই কে দেখে হেওয়ার্ড বললেন: আমরা তো গুহায় ঢুকলাম। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি সামনে থেকে আক্রমণে করে তবে আত্মরক্ষার উপায় কি।

হক্-আই হেসে বললো: এই গুহার শেষে আরেকটি মুখ আছে বাইরে যাবার জন্যে। আশা করি তেমন কিছু প্রয়োজন পড়বে না।

এমন সময় বাইরে সেই বনের মধ্যে এক অমানুষিক চিৎকার, সমস্ত অরণ্য কে যেন কাঁপিয়ে দিল।

অ্যালিস ভয়ে উঠে বসলো। তার মুখ দেখে মনে হল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

হক্-আই বললো: হঠাৎ কিসের শব্দ? কিসের চিৎকার? এত ভয়াবহ চিৎকার আমি জীবনে শুনিনি। পরে সে আংকাম কে বললো: আংকাম বাইরেটা ভাল করে দেখে এসো তো।

আংকাম আর দেরি না করে সেই বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। চিন্‌গাচ্‌গুক গুহার মধ্যে যে আগুন জ্বেলেছিল তা'কে ঘিরে সবাই বসে। হক্-আই তার বন্দুকটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছিলো যে গুলি ভরা আছে কিনা। সবাই আংকামের প্রতীক্ষায় গুহার মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রত্যেকের মনেই এক ভয়, যদি আংকাম কোন অশুভ সংবাদ আনে। আগুনের আলোতে প্রত্যেকের ছায়া গুলো দেওয়ালে পড়ে এক অদ্ভুত বিকৃত ছবি তৈরী হচ্ছিলো। ঐ ছবিতে কোন মানুষকেই সঠিক চেনা অসম্ভব। সকলে সেই ছবিগুলো দেখছিলো আর আংকামের কথা ভাবছিলো। আংকাম অবশ্য বাইরে গিয়ে খুব বেশী দেরি করে নি। সে ফিরে এসে বললো: কিছুই দেখতে পেলাম না। বনের মধ্যে কোথাও কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। আর কোন শব্দও শোনা যায় নি।

হক্-আই বললো: তা'হলে ওটা কিছুই নয়। আমাদেরই মনের ভুল। পরে তিনি হেওয়ার্ড-কে বললেন: সামান্য শব্দে ভয় পাবার কিছুই নেই। কোন কিছু যদি আদৌ ঘটে, তবে আমরাও জবাব দিতে পারবো। আপাতত আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করে, দিব্যি আরামে ঘুম দিতে পারি। এই

বনের মধ্যে এমন নিরাপদ জায়গা আর আপনি কোথাও পাবেন না। কর্ণেল মনরোর কন্যাদের একটু জিরিয়ে নিতে বলুন। আবার সূর্য উঠলেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

হেওয়ার্ড বললেন: আপনার কথাই ঠিক। কোরা এবং অ্যালিসের একটু বিশ্রাম দরকার। না হলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

সে কথা শুনে কোরা এবং অ্যালিস উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো এবং মৃদু গলায় বললো: রাতের মত আমরা রক্ষা পেয়েছি বলা চলে। আমরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হতে পারি।

অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌

[বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌। জীবিত অবস্থায় একজন বহু বিতর্কিত মানুষ। একটি বড় লেখক গোষ্ঠীর নায়ক। তাঁদের জীবন-বোধ ছিল চরিত্র গঠন করা শিল্পের ধর্ম নয়। সত্য শিল্প-কর্ম কোন মানুষের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নেবে না। শিল্পের জন্যেই শিল্প।

এই বহু বিতর্কিত নায়কের ব্যক্তিগত পোষাকও ছিল বিচিত্র। ব্যবহারও ছিল অদ্ভুত। তিনি তাঁর সতীর্থদেরও এই বিচিত্র ধরণের পোষাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেন। এবং আচার-ব্যবহারে বৈচিত্র আনবার ওপর জোর দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ মানুষের আচার-ব্যবহার সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

তৎকালীন সাহিত্য-সমাজ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হিসাবে গন্য করেনি। কিন্তু বর্তমানে তাঁর খ্যাতি আকাশ চুম্বি। এবং মহাকালে উত্তীর্ণ। তিনি নাট্যকার। ছোট গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত। তাঁর নানা লেখা ইউরোপের নানা ভাষায় অনূদিত। এবং প্রশংসা ধন্য। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "The Picture of Dorian Gray" চলচিত্রে রূপায়িত। নাটক "The Importance of Being Earnest" নানা দেশে অভিনীত। কিন্তু তবুও এখনও অনেক ছোটগল্প, রূপকথার গল্প এবং অন্যান্য রচনা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়। এমন কি লোকচক্ষুরও অন্তরালে।

"সুখীরাজপুত্র" গল্পটি মানবিকতার এক আশ্চর্য উত্তোরণ। পৃথিবীতে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে তার ব্যক্তিগত সুখ, আনন্দ এবং লাভ-লোকসানের চিন্তাতেই বিভোর। এবং সেইজন্যেই আমৃত্যু সংগ্রাম। কিন্তু এখানে রাজপুত্রের চিন্তা ভিন্নমুখী। সে এই মানব-জগতের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে স্বার্থহীন ভাবে নিয়োজিত। এবং তারই সাফল্যে আনন্দিত। আবার ব্যর্থতায় গভীর গ্লানীতে পূর্ণ। এ গল্পে সোয়ালো পাখীর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এ চরিত্রের তুলনা মেলা ভার। কিন্তু দুঃখের কথা, তার এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের কেউ মূল্য দেয়নি। লেখকের মূল বক্তব্য : নিঃস্বাস ত্যাগের স্বীকৃতি পার্থিব জগতে সম্ভব নয়।

এ গল্পে শহর প্রধানদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (যারা সব সময়ই নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় বিভোর) এবং রাজপুত্রের চরম নিঃস্বার্থপরতার যে চমকপ্রদ ও তুলনামূলক ছবি পাওয়া যায় তা' অতুলনীয়। এবং সেই অনুভূতি ও আস্বাদই এই গল্পকে এক গভীর মূল্যবোধে ও মানবতা বোধে প্রতিষ্ঠিত করেছে।]

রাজপুত্রের মৃত্যু হল। সুখী রাজপুত্র। সারা জীবন কোন দুঃখ তাকে স্পর্শ করে নি। দেশের লোকেরা তাকে ভাল করেই চিন্‌তো। জান্‌তো। সেইজন্যে তার মৃত্যুর পর তারা রাজপুত্রকে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, লম্বা স্তম্ভের ওপর একটা মূর্তি তৈরী করে দিল। মূর্তি তৈরী করবার সময় রাজপুত্রের শরীরটা একটি ধাতুতে তৈরী করে, শেষে সোনার পাত্‌লা পাত্‌ দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিল। চোখে দুটো ভাল এক জোড়া নীলকান্তমনি বসালো এবং হাতে যে তরবারী ছিল তার মাথায় একটি বড় উজ্জ্বল লাল রুবী বসিয়ে দিল। ফলে রাজপুত্র জীবিত অবস্থায় যে রকম দেখতেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর দেখতে লাগলো।

যে শহরে মূর্তিটা বসানো হল, সেখানকার অঞ্চলপ্রধান ঐ মূর্তিটাকে নিয়ে নিজে বেশ একটু নাম কেনার তালে ছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন জনসভায় ঐ সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটাকে নিয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন। তার কারণ তিনি চাইছিলেন যে ঐ শহরে চট্‌ করে তাঁর একটু নাম হোক। তিনি কথার কথায় বলতে লাগলেন যে সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটা দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে। ওটাকে একটা শিল্পকলার নিদর্শন ও বলা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশের লোকেরা কখনই যেন না ভাবেন যে জীবিত অবস্থায় সুখী রাজপুত্রের কোন বাস্তব বুদ্ধি ছিল না। আমি জানি ঐ রাজপুত্র একজন বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ছিল।

কিন্তু দেশের লোকেরা সকলেই জানতো যে রাজপুত্র যখন বেঁচেছিল তখন সারা জীবন সে সুখেই কাটিয়েছে। কোন দুঃখ বা কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি তাকে কোনদিনও হতে হয়নি। এবং সেইজন্যেই তাকে সুখী-রাজপুত্র বলা হত। কিন্তু ঐ অঞ্চলপ্রধান, রাজপুত্র সম্পর্কে উলটো কথা বলার একমাত্র কারণ, যা'তে দেশের সমস্ত লোকেরা তার এ কথা শুনে

অবাক হয় এবং সমস্ত জনসাধারণের নজর তার দিকে পড়ে। অর্থাৎ তিনি যা'তে অল্পে বেশ একটু নাম কিনতে পারেন। এবং দেশের লোকেরা অকারণ তাকে যেন একটু খাতির করে চলে। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তাঁর এ কথা বলায় দেশের লোকের ধারণা একটুও পালটাবে না। কারণ রাজপুত্রের জীবিত অবস্থাতেই, সে সুখীরাজপুত্র বলেই সর্ব্বাধিক পরিচিত ছিল। এবং সে পরিচয় এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, কোন ছেলে যদি রাত্রে কান্না-কাটি করতো এবং চাঁদের জন্যে বায়না ধরতো, তখন তার মা ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতো যে রাত্রে কান্নাকাটি করলে তুমি কখনোই সুখী রাজপুত্রের মত হতে পারবে না। সুখীরাজপুত্র কোন কিছুর জন্যে কান্নাকাটি করতো না। কাউকে বিরক্ত করতো না। তুমি যদি সুখী রাজপুত্রের মত হতে চাও, তা'হলে চট্‌পট্‌ ঘুমিয়ে পড়ো।

ঐ রাজপুত্র সম্পর্কে সেই দেশে এমন কথাও চালু ছিল যে, যখন কোন লোক নানা কারণে অসুখী হয়ে পড়তো, তখন সে ঐ রাজপুত্রের মূর্তিটাকে দেখে বলতোঃ আমি জেনে সুখী যে এই পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি লোক সুখে জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছে। সারা জীবনে দুঃখের কোন আঁচড় তার গায়ে লাগেনি।

কখনো কখনো স্কুল ফেরতা ছেলের দল ঐ মূর্তিটাকে দেখে তার বন্ধুদের বলতোঃ ছাখ! মূর্তিটাকে কেমন দেবদূতের মত দেখাচ্ছে। এই রাজপুত্রকে সত্যিই সুখী রাজপুত্র বলা যায়।

তাদের কথা শুনে অঙ্কের মাষ্টার একটু রেগে গিয়ে বলতেনঃ তোমরা কী করে জানলে যে এই মূর্তিটা দেবদূতের মত দেখতে? দেবদূতকে কী তোমরা কখনো দেখেছ?

ছেলেরা বলতোঃ আমরা চোখে দেখিনি বটে, তবে স্বপ্নে দেখেছি। অঙ্কের মাষ্টার ছেলেদের এই কথা শুনে খুব রেগে যেতেন। কারণ ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখুক এবং বাস্তব বুদ্ধি থেকে দূরে সরে যাক, এটা তিনি চাইতেন না। তিনি ছেলেদের মুখে এই সব কথা শুনলেই রেগে যেতেন এবং তাদের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাতেন।

সেই দেশে ঐ রাজপুত্রকে ঘিরে যে সব প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল তা'তেই বোঝা যায় যে রাজপুত্র জীবিত কালে খুবই সুখে ছিল এবং সেইজন্যেই তা'কে সকলেই সুখী রাজপুত্র বলে জানতো। কোথাও কোন দুঃখ বা রূঢ় বাস্তবতার প্রসঙ্গ এলেই তারা ঐ সুখী রাপুত্রের কথা মনে করিয়ে দিত। এবং তুলনা-মূলক ভাবে তাকে সে আলোচনায় টেনে আনতো।

একদিন অনেক রাতে একটি ছোট্ট সোয়ালো পাখী সেই শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। তার বন্ধুরা ছ'সপ্তাহ আগে ঐ শহরের ওপর দিয়ে উড়ে ঈজিপ্টের দিকে চলে গেছে। সে'ও তাদের সঙ্গেই যেত। কিন্তু যাবার পথে সে যখন একটা নদীর ঢালুপথ বেয়ে নীচে নামছিল, তখন তার সঙ্গে একটা সুন্দর প্রজাপতির দেখা হয়ে গেল। সে প্রজাপতিটার দিকে অবাক চোখে তাকালো। এত সুন্দর প্রজাপতি সে জীবনে দেখেনি। সে ভাবলো, এর সঙ্গে একটু গল্প করে নি। আমার বন্ধুরা এগিয়ে যাক। আমি পরে গিয়ে তাদের ধরে ফেলবো।

ছোট্ট সোয়ালো পাখীটা এই কথা ভেবে ঐ সুন্দর প্রজাপতির কাছে এসে বললো ঃ তুমি দেখতে ভারী সুন্দর। এসো দু'দণ্ড গল্প করি।

পাখীটার কথা শুনে ঐ সুন্দর প্রজাপতি তার দিকে একবার আড় চোখে তাকালো। কিন্তু কোন কথা বললে না।

সোয়ালো পাখী ভাবলো, তা'হলে তার কথা শুনে প্রজাপতিটা নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছে। সে প্রজাপতির রাগ ভাঙ্গাবার জন্যে তাকে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো। তা'কে নানা কথায় তোষামোদ করতে লাগলো। কিন্তু তা'তেও যখন প্রজাপতির মান ভাংলো না, তখন সে সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউয়ের জল নিজের ছোট্ট পাখা দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। এবং এইভাবে সে তার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলো' কিন্তু হায়! প্রজাপতিটা তখনও কোন কথা বললো না। সোয়ালো পাখীটা ভাবলো, তা'হলে কী করা যায়? প্রজাপতির মান ভাঙ্গানো যাচ্ছে

না। সে একটা গাছের মাথায় বসে চিন্তা করতে লাগলো। এইভাবে সারা গ্রীষ্মকালটা তার সেখানেই কেটে গেল।

এদিকে তার বন্ধুরা ঈজিপ্টে যাওয়ার পথে প্রতি মুহূর্তে পেছনে তাকাতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো যে, এবারে নিশ্চয়ই তার বন্ধু এসে পড়বে। কিন্তু সোয়ালোর দেখা নেই। উড়তে উড়তে একটি পাখী বললো: ওর কথা ভেবে আর কী হবে। আমাদের কথা সে ভুলে গেছে। এখন আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সুতরাং ওর কথা না ভেবে আমরা উড়ে যাই চলো। তা' না হলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে।

তারা দল বেঁধে উড়ে যেতে লাগলো। জোরে—আরো জোরে। এই ভাবে শরৎকাল শেষ হল।

এদিকে অনেকদিন একা থাকার ফলে সেই ছোট্ট সোয়ালো পাখীটার আর ভাল লাগছিল না। তখন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আর কি। তার আশা ছিল প্রজাপতি তার সঙ্গে একদিন নিশ্চয়ই কথা বলবে। কিন্তু দীর্ঘদিন প্রজাপতি তার সঙ্গে কোন কথাই বললো না। তখন সোয়ালো ভাবলো যে, এই প্রজাপতিটা দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, আসলে এর মনটা খুব নীচু। তা'কে এতদিন অকারণ নানা ছলচাতুরী আর চালাকী করে আটকে রেখেছে। এটা তার ইচ্ছাকৃত কাজ। তা'না হলে সামান্য কিছু কথা সে অনায়াসেই তার সঙ্গে বলতে পারতো। তা'তে কারো কিছু ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু প্রজাপতি তা করেনি। অথচ সোয়ালো পাখীটা স্পষ্ট দেখতে পায় যে যখন সমুদ্রের ধার বেয়ে সুন্দর বাতাস বয়ে যায়, তখন ঐ প্রজাপতিটা খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং সেই হালকা বাতাসের সঙ্গে মহানন্দে খেলা করে এবং কথা বলে।

এই সব দেখে শুনে ঐ ছোট্ট সোয়ালো পাখীটার ধারণা হল যে, এই প্রজাপতিটার তার নিজের বাসস্থান এবং এলাকার ওপর খুব টান। সে নিজের বাসস্থান এবং এলাকা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। কোথাও যেতেও চায় না। সোয়ালো পাখীটার মনে মনে একটা ইচ্ছে ছিল যে যদি-

এই সুন্দর প্রজাপতিটার সঙ্গে ভাব জমানো যায়, তবে সারা পথটা বেশ জমিয়ে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। কিন্তু প্রজাপতিটা তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল বলে গোড়াতেই তার সঙ্গে আলাপ করা বন্ধ রেখেছিল। কারণ সে নিজের এলাকা, বাসস্থান, ও পরিবেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক নয়। সোয়ালো পাখীটাও শেষের দিকে তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল যে এই প্রজাপতি অত্যন্ত ঘরকুনো। একমাত্র ঘরকেই ভালবাসে। দেশে দেশে উড়ে বেড়াতে বা নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালবাসে না। কিন্তু সে নিজে উড়তে ভালবাসে। দেশ দেখতে ভালবাসে। সুতরাং এমন এক জনের সঙ্গে তার একটুও বনবে না। দিনরাতই ঝগড়া চলতে থাকবে। এই সব কথা চিন্তা করে সোয়ালো পাখীটা এবারে যাত্রা করবে ঠিক করলো। এবং যাত্রা করবার আগে শেষ বারের মত সে প্রজাপতিকে বললো: তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

প্রজাপতি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো ঃ না আমি ঘর ভালবাসি। বাসা বাঁধতে ভালবাসি। ক্রমাগত উড়ে বেড়াতে আমি পারি না। আমার ভাল লাগে না।

পাখীটা বললো ঃ তা'হলে এতদিন তুমি আমার সঙ্গে চালাকী করেছ। নানা ছলচাতুরী করে আমাকে আটকে রেখেছ। যাইহোক আর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি না। আমি চললাম। বিদায়।

ছোট্ট সোয়ালো পাখীটা আর অপেক্ষা না করে উড়ে চলে গেল। উড়তে উড়তে তার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল। তারা অনেকদিন আগে ঈজিপ্টের পথে রওনা হয়ে গেছে। হয়তো বা এতদিনে সেখানে পোঁছেও গেল। সেই ছোট্ট পাখীটা জোরে জোরে পাখা নেড়ে উড়ে যেতে লাগলো। যদি এই ভাবে কিছু সময় কমিয়ে ফেলা যায়। কিছুদিন আগে পোঁছানো যায়।

সে সারাদিন একটানা উড়ে গেল। শেষে অনেক রাত্রে সামনে একটা শহর দেখতে পেয়ে সেখানে এল। সে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার। সে যে শহরে এসে পোঁছুলো, সেটা তখনও ভাল করে তৈরী হয়নি। প্রস্তুতির পথে।

সে ভাবলো কোথায় বিশ্রাম নেওয়া যায়। রাতের মত একটা বিশ্রামের জায়গা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। খুঁজতে খুঁজতে শেষে সে শহরের শেষ প্রান্তে অনেক উঁচু একটা জায়গা দেখতে পেল। সেখানে লম্বা স্তম্ভের ওপর একটা মুর্তি বসানো। সেটা সুখী রাজপুত্রের। পাখীটা সেখানে এসে অত্যন্ত খুশি হয়ে আপন মনেই বলে উঠলোঃ আঃ! ভারী চমৎকার জায়গা। এত উঁচু বলে সুন্দর বাতাস বইছে। রাতে বিশ্রামটা ভালই হবে। এই বলে সে সেই সুখী রাজপুত্রের পায়ের পাতায় এসে বসলো এবং বিশ্রামের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলো। যেইমাত্র সে তার ছোট্ট ডানায় মাথা রেখে শুয়েছে, তখনই এক ফোটা জল তার গায়ে এসে পড়ল। পাখীটা চমকে উঠে বললোঃ কী আশ্চর্য ব্যাপার! আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। পরিষ্কার আকাশ। তারারা সুন্দর ফুটে আছে। উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। তার মধ্যেও বৃষ্টি। সে তার দৃষ্টি সারা আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উত্তরে নিয়ে এল। উত্তর-আকাশে অবশ্য কিছুটা মেঘ জমে ছিল। এবং বৃষ্টির একটা সংকেত ও পাওয়া যাচ্ছিল। তা' দেখে পাখীটা আপন মনেই বলে উঠলোঃ যেহেতু আমার বিশ্রাম দরকার, সেইহেতু ভগবান এখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি দেবেন। কিন্তু এখন বৃষ্টি যদি সত্যিই হয়, তবে বুঝতে হবে যে এটা ভগবানের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় ফোটা জল গায়ে এসে পড়ল।

তখন সে বিরক্ত হয়ে বললোঃ সামান্য বৃষ্টি যদি একটা মুর্তি আটকাতে না পারে তবে অকারণ থাকা কেন? এই সব স্মৃতি স্তম্ভ রাখার অর্থ কি? না রাখলেই পারে? না! এখানে আরামে ঘুম হবে না। দেখি আশে-পাশের কোন কারখানার অলিন্দে যেতে পারি কিনা। কিম্বা কোন কোটরে। যেখানে অন্ততঃ রাতটুকু ভালভাবে কাটাতে পারবো।

পাখীটা উড়বে বলে পাখা ছড়ালো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ফোটা জল তার গায়ে এসে পড়ল। তখন পাখীটা মুখ তুলে দেখে বললোঃ আঃ! সে কি দেখছে! অবাক কাণ্ড।

গড়িয়ে আসছে। সেই চাঁদনী রাতে সুখী রাজপুত্রের জলে ভরা নীলকান্তমনির চোখ দুটো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তা' দেখে পাখীর মনটা করুনায় ভরে উঠলো। সে বললো : কে আপনি ?

: আমি সেই সুখী রাজপুত্র।

: আপনি কাঁদছেন কেন ? দেখুন তো আপনি আমাকে কেমন ভিজিয়ে দিয়েছেন।

সুখী রাজপুত্রের মুর্তিটা তখন বলতে লাগলো : যখন আমি জীবিত ছিলাম এবং যখন আমার মানুষের মত মন ও হৃদয় ছিল, তখন আমি চোখের জল কী জিনিষ তা' জানতাম না। কারণ, আমি একটা বিরাট রাজপ্রাসাদে বাস করতাম। যেখানে দুঃখ বলে কোন জিনিষ ছিল না। অর্থাৎ দুঃখকে সেখানে কোন দিনও ঢুকতে দেওয়া হত না। দিনের বেলায় আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে খেলা করতাম এবং রাতে সেই প্রাসাদের বড় নাচ ঘরে নেচে বেড়াতাম। রাজপ্রাসাদের বাগান খানা একটা সুন্দর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। ঐ দেওয়ালের বাইরে কি আছে, আমি কারো কাছে একবারও জানতে চাইনি। এমনকি সারা জীবনে আমার একদিনের জন্যে জানতেও ইচ্ছে হয় নি। তখন আমার কাছে সব কিছুই সুন্দর ছিল। এক কথায় সব কিছু সুন্দর জিনিষই আমাকে দেখানো হ'ত। এবং দেখতে দিত। আমি সেই ভাবেই সারা জীবন কাটিয়েছি। আমার বন্ধুরা আমাকে সুখী রাজপুত্র বলে ডাকতো। এবং জানতো। এখন আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তখন আমি সত্যিই সুখী ছিলাম। কারণ এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ যা পেয়ে থাকে, আমি তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু পেয়েছি। অবশ্য আমি পার্থিব আনন্দকেই সুখ বলতে চাইছি। আমি এই ভাবে সারা জীবন বেঁচে ছিলাম এবং শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর দেশের লোকেরা আমার মূর্ত্তিটাকে এত উঁচুতে বসিয়েছে যে এখান থেকে শহরের সমস্ত কুৎসিত জিনিষ এবং দুঃখ-কষ্ট আমার নজরে আসছে। প্রতিদিন আমি স্পষ্ট ভাবে ঐ সমস্ত জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। যদি ও আমার এই শরীর এবং মন শক্ত সীসে দিয়ে তৈরী তবুও প্রতিদিন ঐ সব জিনিস দেখে

দেখে আমার মন ক্লান্তিতে ভরে গেছে। এবং সেই জন্যেই প্রতিদিন আমার ছু'চোখ ভরে জল আসে। আমার কান্না পায়। আমার জীবিত অবস্থায় এই সব কিছুই আমাকে দেখতে হ'ত না। আমার জানাও ছিল না।

সুখী রাজপুত্র আবার বলতে লাগলো: ছাখো! এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি, শহরের অনেক দূরে ছোট একটি কুটিরের জানালাটি খোলা। সেই জানালা দিয়ে আমার পরিষ্কার চোখে পড়ছে, একজন মহিলা একটি টেবিলের পাশে বসে আছে। তার চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। হাত ছুটো অত্যন্ত রুক্ষ। এবং সারা হাতে সূঁচ ফোটার দাগ। আমি জানি যে, সে সারা দিন সেলাই করে সংসার চালায়। সে এখন বসে বসে একটা সুন্দর নক্সা-কাটা গাউন তৈরী করছে। যে গাউনটা পরে এ দেশের বর্তমান রাজার কুমারী-কন্যার অভিষেক হবে। এবং সে সেই শুভ দিনে ঐ গাউন পরে উজ্জ্বল আলোয় ভরা রাজপ্রাসাদে নাচবে। আমি আরো দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ মহিলাটির পাশে একটি বিছানায় তার ছোট্ট ছেলে শুয়ে। সে অসুস্থ। তার জ্বর হয়েছে। ছেলেটি একটি কমলালেবুর জন্যে তার মাকে বিরক্ত করছে এবং কান্নাকাটি করছে। কিন্তু মায়ের হাতে বর্তমানে এমন পয়সা নেই যে, সে একটি কমলালেবু কিনে দিতে পারে। সে শুধু সমুদ্রের জল ছেলেকে খেতে দিচ্ছে। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। সেইজন্যেই আমার ছু'চোখ ভ'রে জল আসছে। আমি এ তুঃখ চোখে দেখতে পারছি না। সহ্য করতে পারছি না। আচ্ছা! ছোট্ট পাখী! তুমি বন্ধুর মত আমার একটা কাজ করবে?

ছোট্ট পাখীটা বললো: কী কাজ?

সুখী রাজপুত্র বললো: আমার তরবারির মাথায় যে লাল রুবীটা বসানো আছে, ওটার দাম অনেক। তুমি ঐ লাল রুবীটা ছেলের মাকে দিয়ে এস। এ কাজটা আমারই করা উচিত। আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু এই স্তম্ভের সঙ্গে এ দেশের লোকেরা আমার পা ছুটো এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছে যে আমি নড়তে পারি না।

ছোট্ট পাখীটা রাজপুত্রের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললোঃ ভোর হলেই আমাকে ঈজিপ্টে চলে যেতে হবে। সেখানে একটা নদীর ধারে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি পেঁছুতে হবে।

রাজপুত্র বললোঃ শোনো! ছোট্ট পাখী। তুমি আমার বন্ধু। তুমি একটা রাত কী আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পার না? আমি দেখতে পাচ্ছি ছেলেটা খুবই তৃষ্ণার্ত। সে জল খেতে চাইছে। এখন তার একটা লেবু খুবই দরকার। ছেলেটির মা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে। তুমি আমার দূত হয়ে সেখানে যাও এবং ওটা দিয়ে এস। এটা আমার হুকুম নয়। অনুরোধ।

ছোট্ট পাখীটা জবাব দিলঃ আমি ছোট ছেলেদের বিশেষ পছন্দ করি না।

রাজপুত্র অবাক হয়ে বললোঃ কেন? সোয়ালো পাখী বললোঃ গত গ্রীষ্মে আমরা যখন একটা নদীতে স্নান করছিলাম, তখন একজন জাঁতা-ওয়ালার দুটি দুষ্টু ছেলে আমাদের দিকে অকারণে বার বার ঢিল ছুঁড়ছিল। যদিও সে ঢিল আমাদের গায়ে লাগে নি। আমরা অনেক দূরে ছিলাম। কিন্তু তবুও আমাদের আঘাত পাবার সম্ভাবনা ছিল। আমার ধারণা ছিল তারা ভাল ঘরের ছেলে। কিন্তু তাদের কাজ দেখে আমার ধারণা পালটেছে। আমি সেই থেকে ছোট ছেলেদের অপছন্দ করি। ছোট ছেলেদের আমার ভাল লাগে না।

কথা বলা শেষ করে ছোট্ট পাখীটা সুখী রাজপুত্রের দিকে তাকালো। দেখলো, তার চোখে-মুখে একটা দুঃখের ছাপ। সে বুঝলো যে রাজপুত্র তার কথা শুনে খুবই দুঃখ পেয়েছে। তখন সে একটা চিন্তা করে বললোঃ যদিও এখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। তবুও একটা রাত আমি আপনার এখানে থাকবো এবং আপনার দূত হয়ে সেখানে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে সুখী রাজপুত্রের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে হাসি মুখে বললোঃ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। যদিও তোমার কষ্ট হবে, তবুও তুমি এ কাজ করলে আমি খুশি হব।

ছোট্ট পাখীটা তখন রাজপুত্রের তরবারি থেকে বড় রুবীটা, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে গেল।

সে বড় বড় রাজপ্রাসাদের ছাদ পার হয়ে গেল। নানা কারুকার্য-মণ্ডিত বড় বড় গীর্জা গুলো পার হল। শেষে সে সেই দেশের রাজার প্রাসাদ পার হবার সময় নাচের বাজনা শুনতে পেল। দেখলো রাজকুমারী সেই নির্জন রাতে তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আর তার বন্ধুকে বলছেঃ তারা গুলো কি সুন্দর কেমন মিটিমিটি জ্বলছে। কয়েক দিন পরেই আমার অভিষেক হবে। আমি আশা করি, এই সময়ের মধ্যেই আমার চমৎকার পোষাকটা তৈরী হয়ে যাবে। আমি সেই পোষাক পরে ঐ দিন রাতে নাচ ঘরে নাচতে পারবো। কিন্তু যাকে ঐ পোষাকটি তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে, সে এত অলস যে ঠিক সময়ে পোষাকটা আমাকে দিলে হয়।

তার বন্ধু বললোঃ না। না। তুমি ভাবনা কোরো না। তোমার পোষাক তুমি ঠিক সময়েই পেয়ে যাবে।

ছোট্ট পাখীটা সেই কথা শুনে আকাশ পথে উড়ে চলে গেল। সে নদী পার হল। দেখলো একটা জাহাজের মাস্তুলে হ্যারিকেন জ্বলছে। আরো জোরে সে উড়তে উড়তে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এল। সেখানে দেখলো এক দল লোক নানা জিনিস নিয়ে কেনা-বেচা করছে। সে সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। শেষে অনেক ঘুরে সেই গরীবের কুটিরে এসে বসলো। সোয়ালো পাখীটা ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখলো যে, ছেলেটা তার বিছানায় শুয়ে জ্বরে কাঁপছে। এবং তার মা অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আধো ঘুমে ঢুলছে।

পাখীটা ঘরখানা ভাল করে দেখে নিয়ে ভেতরে এসে টেবিলে রুবীটা রাখলো এবং ঐ অসুস্থ ছেলের পাশে এসে নিজের পাখা দিয়ে আলতো ভাবে বাতাস করতে লাগলো। তা'তে ছেলেটি তার দু'চোখ বুঁজেই বলে উঠলোঃ আঃ! কী আরাম! আমার শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। তা'হলে নিশ্চয়ই জ্বর কমে আসছে। আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি।

ছেলেটির চোখের পাতায় আবার গভীর ঘুমের ঘোর নেমে এল। এবং সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পাখীটা তার কাজ শেষ করে, সেই সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে সব কথা জানালো। সে বললো : বাইরে এখন যদিও খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু তবুও আমি এ কাজ করতে পেরে বেশ আনন্দ অনুভব করছি। এবং একটা উত্তেজনা আমাকে ঘিরে আছে। যে কারণে এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আমার কোন ঠাণ্ডা লাগছে না।

সোয়ালো পাখীর কথা শুনে সুখী রাজপুত্র বললো : এটা তোমার ভাল কাজের ফল। তুমি একটা ভাল কাজ করে এলে বলেই ভেতরে ভেতরে একটা আনন্দের উত্তেজনা তোমাকে ঘিরে রয়েছে। সেইজন্যেই তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

রাজপুত্রের কথা শুনে সেই ছোট্ট পাখীটা চিন্তা করতে লাগলো এবং অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরে পাখীটার ঘুম ভাংতে সে নদীতে স্নান করতে উড়ে চলে গেল। সেই নদীর ধার দিয়ে একজন অধ্যাপক বেড়াচ্ছিলেন। তিনি এই শীতে ছোট্ট একটি পাখীকে স্নান করতে দেখে অবাক হয়ে ভাবলেন, এত শীতে পাখীটা স্নান করছে। কী আশ্চর্য! এমন তো আগে কখনো দেখি নি। তিনি চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরে দৈনিক কাগজে বেশ ফলাও করে চিঠি লিখলেন। এবং ব্যাপারটা কাগজ মাধ্যমে প্রত্যেককে জানালেন।

ছোট্ট পাখীটা রাজপুত্রকে বললো : আজ রাতে কিন্তু আমি ঈজিপ্ট রওনা হয়ে যাব। রাজপুত্র সে কথার কোন জবাব দিল না।

পাখীটা ভাবলো আজকে তো এই শহর ছেড়ে যাব সুতরাং ভাল করে একবার দেখে আসি। সে রাজপুত্রকে আর কোন কথা না বলে উড়ে চলে গেল। পরে মিনারের চূড়ায় বসে শহরটাকে ভাল করে দেখতে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ গীর্জার মাথায় বসে রইল। চড়ুই পাখীরা কিচির-মিচির করে তাদের মধ্যে বলতে লাগলো : কী সুন্দর দেখতে পাখীটা।

আমাদের দেশে বোধ হয় নতুন এসেছে। সোয়ালো পাখী সে কথা শুনে বেশ আনন্দ পেল।

এই ভাবে সারাটা দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। চাঁদ মাথায় উঠে এল। পাখীটা ধীরে ধীরে সেই সুখী রাজপুত্রের কাছে শেষ বিদায় জানাবার জন্যে উড়ে এল। এবারে সে যাত্রা করবে।

তা'কে দেখে রাজপুত্র অবাক হয়ে বললো! সে কি! তুমি এখনও যাও নি?

ঃ না। এবারে আমি যাত্রা করব।

রাজপুত্র একটু চুপ করে থেকে বললোঃ আচ্ছা বন্ধু! তুমি আর একটা রাত কি এখানে অপেক্ষা করতে পার না? করলে কিন্তু খুবই ভাল হত।

ঃ কেন?

ঃ শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটি চিলে-কোঠার ঘরে আমি একজন যুবককে দেখতে পাচ্ছি। সে চেয়ারে হেলান্ দিয়ে বসে আছে। তার চুল গুলো বেশ কোঁকড়ান। স্বপ্নালু বড় বড় চোখ। সে অনেক রাত জেগে একটা নাটক শেষ করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আগামীকাল তা'কে এই নাটক শেষ করে থিয়েটারের পরিচালকের হাতে তুলে দিতেই হবে। কিন্তু তার এত ঠাণ্ডা লাগছে এবং সে এত ক্ষুধার্ত যে অজ্ঞান অবস্থায় ঐ ভাবে পড়ে আছে। তা'কে একটু সাহায্য না করলেই নয়।

ঃ বেশ! আমি আজ রাতটাও অবস্থান করব। তা'হলে এবারে কি আরেকটা রুবী আমি তাকে দিয়ে আসবো?

রাজপুত্রের ব্যবহার সোয়ালো পাখীটার বেশ ভাল লাগছিল।

রাজপুত্র বললোঃ হায়! আমার আর কোন রুবী নেই। এখন আমার সম্বল চোখ দুটো। নীলকান্তমনির চোখ। অনেক দামী। যে চোখ জোড়া হাজার বছর আগে ভারত থেকে আনা হয়েছিল। তুমি এখন আমার একটি চোখ্ উপড়ে নাও এবং ঐ যুবককে দিয়ে এস। সে কোন সোনার দোকানে বা কোন হীরে-জহরতের ব্যবসায়ীকে এই মণি বেচে টাকা

সংগ্রহ করবে এবং তার প্রয়োজন মত খাদ্য ও আগুনের জন্যে কাঠ কিনে এনে নাটক শেষ করতে পারবে। আজকে তাকে নাটক শেষ করতেই হবে। সুতরাং এ মনি তার খুবই কাজে লাগবে।

রাজপুত্রের কথা শুনে সেই ছোট্ট পাখীটার ত্ব'চোখ ভরে জল এল। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো : এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না। প্রিয় রাজপুত্র ! আপনি কি বলছেন সেটা একটু ভাল করে ভেবে দেখুন।

. রাজপুত্র বললো : তুমি আমার বন্ধু এবং দূত। সুতরাং তোমাকে যা' বলি শোনো। কোন প্রতিবাদ করো না।

পাখী বেচারী আর কি করবে। সে ঠোঁট দিয়ে রাজপুত্রের একটা চোখ উপড়ে নিয়ে, সেই যুবকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

যুবকের ঘরটাতে ঢুকতে কোন অসুবিধা হ'ল না। কারণ ঘরের ছাদে একটা ফুটো ছিল। সে সেই ফুটো দিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং যুবকের পাশে পড়ে থাকা একটা শুকনো কার্পেটের ওপর নীলকান্তমণিটা রেখে চলে এল। যুবকটি তার হাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। সেইজন্যে কোন শব্দ পেল না। তারপর হঠাৎ তার ঘুম ভাংতে সে শুকনো কার্পেটের ওপর একটি সুন্দর নীলকান্তমণি দেখতে পেয়ে লাফিয়ে বলে উঠলো : আমার নাটকটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হচ্ছে। এটা তারই শুভ সূচনা। এ নাটক নিশ্চয়ই সকলকে আনন্দ দেবে। সে নীলকান্তমণিটা হাতে তুলে নিয়ে বললো : আমার সমস্যা মিটেছে। এখন আমি আমার নাটক শেষ করতে পারবো।

আনন্দে তার চোখ ত্বটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে ছোট্ট পাখীটা মনে মনে ঠিক করল যে, যত বাধাই আসুক না কেন, সে আজ রাতে রাজপুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজের আস্তনার দিকে পাড়ি দেবে। সে নিজেকে প্রস্তুত করে সারা দিন মনের আনন্দে উড়ে বেড়ালো। সমুদ্রের বন্দরে যে জাহাজ ঘাঁটি ছিল, তার মাথায় বসে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগলো। জাহাজের নাবিকরা কি করে জাহাজের গর্তে মোটা মোটা দড়ি লাগিয়ে হাঁক ছাড়ছে

এবং সেটাকে পাড়ে আনবার চেষ্টা করছে। এক সময় সে আপন মনেই সকলের উদ্দেশে বলে উঠলো ঃ আমার বন্ধুরা! তোমরা শোনো! আজ আমি আমার দেশে রওনা হয়ে যাচ্ছি। তোমাদের আমি বিদায় জানাচ্ছি। বিদায় বন্ধু? বিদায়!

কিন্তু কোন নাবিকই তার দিকে ফিরে তাকালো না। তারা আপন মনে তাদের কাজ করে যেতে লাগলো! সে সারাদিন ঐ মাস্তুলের চুড়ায় বসে থেকে সন্ধ্যায় আবার রাজপুত্রের কাছে শেষ বিদায় জানাতে ফিরে এল। ভাবলো এবারে সে বিদায় জানিয়েই চলে যাবে।

সোয়ালো পাখীটা রাজপুত্রের মুখের দিকে তাকাল এবং ধরা গলায় বললো : আমি শেষ বারের মত বিদায় জানাতে এসেছি। আমি চলে যাচ্ছি।

রাজপুত্র বললো ঃ বন্ধু, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ। আমি তোমার কাছে নানা ভাবে ঋণী। কিন্তু তবুও বলি, আর একটা রাত কি তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পার না?

পাখীটা তখন সোজাসুজি বললো ঃ না। শীত পড়ে আসছে। আর কিছুদিন পরেই বরফ পড়তে শুরু করবে। এখন ঈজিপ্টে গ্রীষ্মকাল। সূর্য প্রখর ভাবে সেখানে কিরণ দিচ্ছে। সেখানে সবুজ পাম-গাছে শীতল হাওয়া বইছে। যেখানে বসলেই শরীর জুড়িয়ে যায়। কুমীরেরা নদী থেকে উঠে এসে, অলস ভাবে পাড়ে শুয়ে গায়ে রোদ লাগাচ্ছে। আমার বন্ধুরা মন্দিরের চুড়ায় চুড়ায় বাসা বাঁধছে। শাদা এবং পিঙ্ক্ রং-এর ঘুঘুরা ভর দুপুরে একটা ঘুমের আমেজ নিয়ে আসছে। এই সময়টা ইজিপ্ট্ সত্যিই মনোরম। বিশ্রাম এবং ঘুমের দেশ বললেই চলে। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তবে আমি আপনাকে ভুলে যাব না। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী বসন্ত কালে আপনার জন্যে দুটো মনি নিয়ে আসবো। যে দুটো মনি আপনি আমাকে দিয়ে দান করালেন। দুটো মনির মধ্যে একটা থাকবে রুবী। যার রং হবে গোলাপের চেয়েও লাল। আর আপনার চোখের জন্যে যে মনি আনবো তার রং হবে সমুদ্রের চেয়েও ঘন নীল।

রাজপুত্র হেসে বললোঃ খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি দেখ, আমাদের কিছু দূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার হাতের দেশলাইয়ের বাক্সটা নর্দমায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ঐ মেয়েটি যদি ঐ দেশলাইয়ের মূল্য হিসাবে কিছু টাকা বাড়ীতে নিয়ে যেতে না পারে, তবে মেয়েটির বাবা তাকে খুবই মারবে। সেইজন্যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করুণ ভাবে কাঁদছে। এই শীতে মেয়েটির পায়ে কোন জুতো বা মোজা নেই। এমন কি তার মাথা ঢাকবারও কোন বস্ত্র নেই। আমি তার কান্না সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমার আরেকটি চোখ এখুনি তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ মেয়েটিকে দিয়ে এস। তা'হলে মেয়েটির বাবা ওকে আর মারবে না।

পাখীটা আরেক বার কেঁদে উঠে বললোঃ আমি আরেকটা রাত এখানে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনার চোখের মনি তুলে তাকে দিয়ে আসতে পারি না। আপনার একটা চোখের মনি আগেই গেছে। এবারে এটা গেলে আপনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবেন। আমি এ কাজ করতে পারি না।

রাজপুত্র বললোঃ শোনো বন্ধু! আমি যা' বলি তাই কর।

পাখী বললোঃ বেশ! আমি যখন কোন দিনও আপনার কথার অবাধ্য হইনি তখন এখনও হ'ব না।

সে তখনই নিজের ঠোঁট দিয়ে রাজপুত্রের অপর চোখটি তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল এবং মেয়েটির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার হাতে ঐ নীলকান্তমনিটা ফেলে দিল।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললোঃ বাঃ! ভারী চমৎকার জিনিষ তো। সে সেটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ী চলে গেল।

সোয়ালো পাখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বললোঃ এখন আপনি সম্পূর্ণ অন্ধ। সুতরাং আমি এখন থেকে সারাক্ষণ আপনার কাছেই থাকবো। কোথাও যাব না।

রাজপুত্র বললোঃ না। না। সোয়ালো। তা' হয় না। তুমি ইজিপ্টে চলে যাও। সেখানে তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

ঃ আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো। এই কথা বলে সোয়ালো পাখীটা রাজপুত্রের পায়ের কাছে এসে বসলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার পর থেকে সেই সোয়ালো পাখীটা সারাদিন রাজপুত্রের কাঁধে বসে থাকতো। এবং সেই দেশে যে সব আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পেত, সেগুলো গল্প করে তাকে শোনাতো।

সে নানা প্রকার পাখীদের গল্প বলতো। যারা নীল নদের তীরে দাঁড়িয়ে এক মনে সোনালী মাছ গুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং মাঝে মাঝে ধরে খেত। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জীব-জন্তুদের কথাও রাজপুত্রকে শোনাতো। যে সব জন্তুদের বয়স প্রায় পৃথিবীর বয়সের সমান। যাদের মাথা এবং বুক ছিল মেয়েদের মত। শরীরটা ছিল কুকুরের মত। ল্যাজটা ছিল সাপের মত। পাখা ছিল পাখীদের মত। থাবা ছিল সিংহের মত। এবং গলার স্বর ছিল মানুষের মত। এ এক অদ্ভুত জীব। যাদের কথা প্রাচীন গ্রীক-গল্পে পাওয়া যায়। এরা দূরগামী পথিকদের নানা সমস্যার কথা আগেই জানিয়ে দিয়ে; তাদের সাবধান করে দিত। সেইজন্যে মরুভূমির যাত্রীরা এদের সাহায্য নিত। মরুভূমির যাত্রীদের কাছে এরা দিক-দর্শকের মত ছিল।

সে মাঝে মাঝে আকাশে তাকিয়ে চাঁদের গল্পও রাজপুত্রকে শোনাতো। চাঁদে যে সব পাহাড় আছে তাদের রাজার কথাও বলতো। যে রাজার গায়ের রং ছিল আবলুষ কাঠের মত। যে রাজা স্ফটিকের মত দেখতে একটা বিরাট আকারের সাপকে উপাসনা করতো। এবং যে সাপটা রাতে প্রকাণ্ড একটা পাম-গাছে ঘুমিয়ে থাকতো। কুড়িজন সাধু ঐ সাপের খাবারের জন্যে সারাদিন ধরে মধু ও রুটি জোগাড় করতো।

সোয়ালোর মুখে রাজপুত্র এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনে আশ্চর্য হ'ত। এবং অবাক হয়ে শুনতো।

রাজপুত্র সোয়ালো পাখীর কাছে এই সব অদ্ভুত গল্প শুনে বললো ঃ তোমার গল্প গুলো ভারী অদ্ভূত। অদ্ভুত সব গল্প তুমি আমাকে শোনালে।

কিন্তু তবুও আমি দেখছি যে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্টের মত অদ্ভুত জিনিষ আর কিছু নেই। আমাদের এই পৃথিবীটা রহস্যে ভরা। সব রহস্যের উৎঘাটন আজো সম্ভব হয় নি। এবং হওয়া সম্ভব ও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের মনের কৃপণতার মত এতবড় রহস্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন কিছুতেই নেই। আমার মনে হয়, কৃপণতাই এই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় রহস্য। এবং মানুষের মনের জটিল পথ।

যাইহোক, তুমি একবার আমার দেশের আকাশ-পথে ঘুরে এস এবং আমাকে বল যে কি দেখলে।

সোয়ালো পাখী তার কথা মত কাজ করলো। সে আকাশ-পথে বড় শহরটা ঘুরে এল। সে দেখলো, ধনীরা সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। এবং গরীবরা তাদেরই দরজায় দরজায় ভিক্ষা করছে। সে অন্ধকার গলির মধ্যেও ঢুকলো। সেখানে দেখলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অভুক্ত অবস্থায় ঐ গলিপথে চুপচাপ বসে আছে। তাদের দৃষ্টি উদাস। মুখ ফ্যাকাসে।

একটি সেতুর তোরনের পাশ দিয়ে সে যখন উড়ে আসছিল, তখন সে দেখলো দুটি ছোট ছেলে ঐ সেতুর ওপর বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে আছে। তারা ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের শরীরটাকে গরম রাখবার চেষ্টা করছে। এমন সময় তাদের পাশে একটা পুলিশ এসে দাঁড়াল। ছেলে দুটো পুলিশকে দেখে বললো: আমাদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে। পুলিশটা সে কথার জবাবে চিৎকার করে বললো: সরে পড়। দেরী কো'রো না। ছেলে দুটো আর কথা বাড়ালো না। তারা পুলিশের ভয়ে ঐ বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করলো।

সোয়ালো পাখী ঘুরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা জানালো। রাজপুত্র শুনে বললো: দেখো সোয়ালো, আমার শরীরটা পাতলা সোনার পাতে মোড়া আছে। তুমি তোমার ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে সে গুলে তুলে ঐ গরীবদের এবং দুঃখী ছেলে মেয়েদের দিয়ে এস। এ জগতে সোনার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। এগুলো পেলে ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। ওরা সুখী হবে।

সোয়ালো পাখী রাজপুত্রের কথা মত কাজ করলো। সে রাজপুত্রের শরীর থেকে সোনার পাত্‌গুলো আস্তে আস্তে তুলে সেই গরীবদের এবং দুঃখী ছেলেমেয়েদের দিয়ে এল। তারা পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগলো। বলতে লাগলো ঃ এবারে আমরা রুটি কিনতে পারবো। আমরা খেতে পাব।

গরীব লোক গুলো তখনি রুটি কিনতে চলে গেল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দে রাস্তায় খেলতে শুরু করে দিল।

সোনার পাত্‌গুলো তুলে ফেলার ফলে রাজপুত্রকে এখন অত্যন্ত কুৎসিত দেখাতে লাগলো। তার চেহারায় আগের মত আর সে চাক্‌চিক্য রইলো না।

এই ভাবে তুষার পড়বার দিন এগিয়ে এল। তুষারে সারা শহরটা ঢেকে গেল। রাজপথগুলো দেখে মনে হতে লাগলো, যেন রুপো দিয়ে মোড়া। হঠাৎ দেখলে বেশ উজ্জ্বল এবং ঝক্‌ঝকে মনে হতে লাগলো। প্রত্যেক বাড়ীর কার্নিসে শাদা ছুরির মত তুষার জমাট হয়ে ঝুলতে লাগলো। ধনী লোকেরা তাদের শীতের পোষাক পরে, ঐ তুষারের মধ্যে বেড়াতে লাগলো। এবং দুঃখী ছেলেমেয়েরাও এখন রাজপুত্রের কল্যাণে জামা, জুতা ও মোজা পরে আনন্দে খেলা করতে লাগলো। কিন্তু সোয়ালো পাখীটার শরীর ক্রমে ক্রমে বরফে ঢাকা পড়তে লাগলো। তার শরীরে হীম জমতে লাগলো। এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডায় সে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু তবুও সে রাজপুত্রকে ছেড়ে গেল না। কারণ সে রাজপুত্রের ব্যবহারে এবং কাজে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলে ছিল। সে শেষে উপায়-হীন হয়ে, একটি রুটির কারখানার দরজার পাশ থেকে এক টুকরো রুটি এনে নিজের পাখায় চেপে ধরে শরীরটাকে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তা'তে বিশেষ কাজ হল না। শেষে সে বুঝতে পারলো যে, তার মৃত্যু দিন ঘনিয়ে আসছে। তখন সে অনেক চেষ্টা করে, শেষ বারের মত রাজপুত্রের কাঁধে উড়ে এসে বসে বললো ঃ বিদায় বন্ধু বিদায়! আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি কি আপনার হাতে আমার শেষ চুম্বন রেখে যেতে পারি ?

রাজপুত্র বললো ঃ আমি শুনে খুশী হলাম যে শেষ পর্যন্ত তুমি ইজিপ্টে যেতে রাজী হলে। তুমি অনেক দিন আমার কাছে কাটালে। এবং অনেক কষ্ট পেলে। কিন্তু তুমি আমার হাতে তোমার ঠোঁটের স্পর্শ রাখবে কেন? তুমি আমার ঠোঁটে তোমার ঠোঁটের স্পর্শ রাখ। আমাকে শেষ বারের মত চুম্বন কর। আমি তোমাকে ভালবাসি।

সোয়ালো বললো ঃ আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি না। আমি মৃত্যুর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি শেষ ঘুম ঘুমোবো। ঘুমই হচ্ছে মৃত্যুর আরেক ভাই। সোয়ালো পাখী এই কথা বলে রাজপুত্রের মুখে তার ঠোঁটের শেষ স্পর্শ রাখলো। এবং তার পায়ের কাছে শুয়ে মারা গেল।

ঠিক সেই সময়ে রাজপুত্রের মূর্তির ভেতর থেকে একটা বুক ফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। মূর্তিটা ফেটে গেল। কিন্তু লোকে দেখে বলতে লাগলো যে, গভীর তুষার পাতের ফলেই মূর্তিটার এই অবস্থা হয়েছে।

পর দিন সকালে মেয়র শহরের অঞ্চল প্রধানকে নিয়ে সেই পার্কে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি বেড়াতে বেড়াতে ঐ মূর্তিটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন এবং অবাক হয়ে বললেন ঃ ইস্! মূর্তিটার কি অবস্থা হয়েছে।

অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ হ্যাঁ! কি অবস্থা হয়েছে।

এই অঞ্চল-প্রধানটি সব সময় মেয়রের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন এবং মেয়র যা বলতেন, তা'তে সায় দিয়ে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করতেন। মেয়রকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে এ অভ্যাসটা তিনি অনেক কষ্টে আয়ত্ত্ব করেছিলেন।

মেয়র মুর্তিটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে সেই স্তম্ভের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং নিখুঁত ভাবে দেখে বলতে লাগলেন ঃ রাজপুত্রের তরবারি থেকে রুবীটা পড়ে গেছে। চোখ দুটো নেই। এবং শরীরের সমস্ত সোনার পাত্‌ও উধাও। সত্যি কথা বলতে কি, এখন এই রাজপুত্রের মূর্তিটাকে একটা ভিখিরীর মত দেখাচ্ছে।

অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে মেয়রের কথায় জোগান দিয়ে বললেন ঃ ভিখিরীর মত দেখাচ্ছে।

মেয়র শেষে রাজপুত্রের পায়ের কাছে মৃত একটা পাখীকে পড়ে থাকতে দেখে বললেনঃ কী আশ্চর্য! একটা মৃত পাখীও দেখছি এখানে পড়ে। আপনি আজই একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলুন যে পরবর্তি কালে পাখীরা যেন কখনোই কোন স্মৃতি স্তম্ভের নীচে না মরে।

অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে সে কথা গুলো তাঁর ডায়েরীতে লিখে নিলেন এবং বললেনঃ হ্যাঁ! না মরে।

শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই সুখী রাজপুত্রের বিকৃত মূর্তিটাকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যাপকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের ধারণা এই বিকৃত মূর্তিটাকে পার্কে সকলের চোখের সামনে রাখার কোন অর্থ হয় না। এটা এখন সরিয়ে ফেলাই উচিত।

সব শেষে মূর্তিটাকে গলিয়ে ফেলা হল। তারপর মেয়র পৌর প্রতিষ্ঠানে একদিন একটা সভা ডাকলেন। তিনি উপস্থিত সদস্যদের কাছে জানতে চাইলেন, এবারে এই গলিত ধাতু দিয়ে আমরা কি করতে পারি। পরে তিনি আবার বললেনঃ মূর্তি অবশ্যই একটা গড়তে হবে। এবং সেটা হবে আমার নিজের মূর্তি।

ঃ হ্যাঁ! আমার নিজের মূর্তি। স্থানীয় অঞ্চল-প্রধানরা প্রত্যেকে সমস্বরে বলে উঠলেনঃ হ্যাঁ! আমার নিজের মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। কার মূর্তি গড়া হবে এই নিয়ে ঝগড়া।

যে ঢালাই কারখানায় রাজপুত্রের মূর্তিটাকে গলানো হয়েছিল মূর্তি সেখানকার শ্রমিক-প্রধান দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেনঃ কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা রাজপুত্রের সমস্ত দেহটা গলিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তার হৃদয়টাকে গলাতে পারি না। কিম্বা তার ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিতে পারি না। সুতরাং আমরা ধাতুর তৈরী রাজপুত্রের এই গলিত পিণ্ডটাকে আর না রেখে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসি।

তারা ঐ পিণ্ডটাকে একরাশ ধূলো মাড়িয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। যেখানে ঐ মৃত সোয়ালো পাখীটাকে আগেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

একদিন ঈশ্বর তাঁর এক দেবদূতকে ডেকে বললেন: এই দেশের সব চেয়ে দামী দুটি জিনিষ তুমি আমার জন্যে নিয়ে এস।

দেবদূত সঙ্গে সঙ্গে সুখী রাজপুত্রের ভাঙ্গা সীসের হৃদয় খানা ও মৃত পাখীটাকে এনে হাজির করলো।

ঈশ্বর খুশি হয়ে বললেন: তোমার পছন্দ নির্ভুল। আমার স্বর্গের উদ্যানে এই ছোট্ট পাখীটা সারাদিন গান গাইবে এবং সুখী রাজপুত্র আমার এই সোনা মোড়া শহর দেখে আমাকে প্রশংসা করবে। বুঝবে যে আমার রাজ্যে দুঃখী বলে কেউ নেই।

চার্লস কিংসলি

[চার্লস কিংসলি কিশোরদের জন্যে অনেক কাব্য এবং গদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। তার মধ্যে "দি হিরোজ" এবং "ওয়াটার বেবিজ" তাঁর মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

গ্রীক-পুরাণের উপাখ্যানকে তিনি কাব্যে পরিবেশন করছেন "দি হিরোজ"-এ। কিন্তু "ওয়াটার বেবিজ"-এ তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন, আজকের সমাজ ব্যবস্থাতেও তা' সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

মনের দিক থেকে সমস্ত দেশের ছেলে-মেয়েরাই এক জগতের মানুষ। এখানে দেশী কি বিদেশীদের মধ্যে যেমন কোন তফাৎ নেই, তেমন উঁচু কি নীচু শ্রেণী বলেও কোন ভেদ নেই। শুধু মানুষের সমাজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিন্যাসই সমস্ত দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

বাইরের এই সীমারেখা বা খোলোসটা যদি সরিয়ে দেওয় যায়, তবে শরীরের ময়লা ধুয়ে যাবার মত মনের ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এবং তখন কোন ধনীর দুলালী মেয়ে এবং ঝাড়ুদারের ছেলে একসঙ্গে বসে একই অন্ন ভাগ করে খেতে পারে।

এখানে এলি বড়লোকের দুলালী মেয়ে। এবং টম ঝাড়ুদারের ছেলে। সমাজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিন্যাসের ফলে এদের কোন প্রকার আপন জন হওয়া বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্বপ্ন জীবনে সাগর তলে যে আনন্দ-মেলা বসেছে, সেখানে সব শ্রেণীর লোকই একাত্ম হতে পেরেছে। সেখানে সবাই আপনজন। মনের দিক থেকে সে জগতের নাম আনন্দলোক। এখানে বড় লোকের মেয়ে এলি এবং ঝাড়ুদারের ছেলে টম বা ঝাড়ুদার গ্রীমসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু সে আনন্দলোকে পৌঁছুতে গেলে মানুষকে সহনশীল হতে হবে। পরিশ্রম, সত্যনিষ্ঠা এবং সাধনা দিয়ে সে আনন্দলোকের দরজা খুলতে হবে।

চার্লস কিংসলির "দি ওয়াটার বেবিজ"-এর মূল উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে দুটি কিশোর-কিশোরীর মর্মলোক অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।]

গরীবের ছেলে টম। মায়ের কথা তার মনে পড়ে না। মা তাকে কত ছোট রেখে মারা গেছে সে জানে না। তবে বাবাকে মনে পড়ে। টমের বাবা ছিল খুব গরীব! অনেক কষ্টে সংসার চালাতো। টমের আজো সে সব ঘটনা কিছু কিছু মনে পড়ে। তখন তার কতই বা বয়স। মাত্র তিন-চার বছরের ছেলে সে। কিন্তু টমের বরাত মন্দ। সেই বাবাও একদিন টমকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে গেল। তখন টমের সে কি কান্না। মা নেই। বাবা নেই। এই পৃথিবীতে সে একা। বাবা চলে যেতে সে কাঁদতে কাঁদতে পথে এসে দাঁড়ালো। কে খেতে দেবে। কে পরতে দেবে। কে থাকতে দেবে। এই সব নানা চিন্তায় টম ভয় পেয়ে গেল।

টম সারা দিন কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। কেউ তাকে দেখলো না। খেতে দিল না। গায়ে হাত দিয়ে একটু আদর পর্যন্ত করলো না। সন্ধ্যার সময় সে যখন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, তখন দেখলো গ্রীমস্ গাঁয়ের ঝাড়ুদার) নেশায় টলতে টলতে সেই পথ দিয়েই আসছে।

গ্রীমস্ কে টম চেনে। এ গাঁয়েরই এক কারখানায় কাজ করে সে। তার কাজ হল কারখানার সমস্ত চিম্‌নি পরিষ্কার রাখা। এবং সেই কারখানার বাড়ী-ঘর, রাস্তা-নর্দমা, উঠোন-বাগান পরিষ্কার করা। টমের বাবাকে সে চেনে। টমের বাবা যে টমকে ফেলে চলে গেছে, সে খবরও তার জানা। সে নেশায় টলতে টলতে টমের পাশে এসে দাঁড়াতে, টম আরো জোরে কেঁদে ফেললো। নেশার ঘোরে গ্রীমস্ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলো। সেই থেকে টমকে সকলেই গ্রীমস্-এর ছেলে বলেই জানে।

এই ঘটনার পর দশটা বছর পার হয়ে গেছে। এর মাঝে সে কত বাড়ী-ঘর, রাস্তা আর নর্দমা পরিষ্কার করছে সে নিজেই জানে না।

গ্রীমস্ কারখানায় যাবার পথে টমকে সাথে করে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেয়। টম সারাদিন কারখানার চিম্‌নি পরিষ্কার করে। রাস্তা, আস্তাকুঁড়, ড্রেন ধুয়ে ঝক্‌ঝকে করে মনিবকে খুশি

করে। মনিবকে খুশি করাই তার কাজ। তবে দুঃখের কথা, এই যে, এত খেটে টম যেক'টা পয়সা মনিবের কাছ থেকে পায় সেটা তখনি গ্রীমস্ কেড়ে নিয়ে নেশা করে বসে থাকে। তার হাতে একটা পয়সাও দেয় না। বরং উল্টো মার-ধোর করে। এক-একদিন সে টমকে এত মারে যে, টম যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে থাকে।

এই ভাবেই টমের দিন চলে যাচ্ছিলো। মার খেয়ে আর কাজ করে।

একটু বয়স বাড়তেই টম তখন চালাক হয়ে গিয়েছিল। কাজে ফাঁকি দিত। বাড়তি পয়সা সরিয়ে রাখতো। সেই পয়সা দিয়ে চা-সিগ্রেট্ খেত। মিথ্যে কথা বলতো। দেরি করে বাড়ী ফিরতো। মারকে সে তখন আর ভয় করতো না। সে তখন বেপরোয়া।

একদিন টম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইটের টুকরো নিয়ে খেলা করছিল। গ্রীমস্ বাড়ী ছিল না। এমন সময় সাইকেলে চেপে একজন লোক এসে তার সামনে থামলো। টম লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। লোকটা টমকে বললো: গ্রীমস্ বাড়ী আছে?

টম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল: না। বাড়ী নেই।

লোকটা বললো: এলে জমিদার বাড়ীতে যেতে বলবি। অনেক কাজ পড়ে আছে। দেরি করে না যেন।

লোকটা আর দাঁড়ালো না। সাঁই সাঁই সাইকেল চালিয়ে যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল।

টম ভাবলো জমিদার বাড়ীতে কাজের অর্থ অনেক কাজ। বড় বড় চটক্দারী সব বাড়ী। বাগান-বাগিচা, দরজা-জানলা, নানা রঙীন টবে বসানো বাহারী পাতার গাছ আর ফুল। সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে। পয়সাও কিছু বেশী পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে বক্‌শিশ্ ও মিলবে। কিন্তু বিপদ হয়েছে যে গ্রীমস্ এসব কিছুই তাকে দেবে না। সব নিজে নিয়ে নেশা করে পড়ে থাকবে আর টমকে ধরে মারবে। কিন্তু তবুও যেতে হবে। জমিদার বাড়ীর ডাক। না গেলে পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে গ্রীমস্ এসে হাজির। টম তাকে সব জানাতে সে আর দাঁড়ালো না। টমকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লো।

গ্রীমস্ আর টম অনেক বস্তি পেরিয়ে পেরিয়ে বড় রাস্তায় এলো। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে শহরে। দু'পাশে কল-কারখানা আর দোকান-পাটে ভরা। বসত বাড়ীও অনেক। টম দেখতে দেখতে চললো। আরো কত পথ চলতে হবে কে জানে। কাঠ-ফাটা রোদে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে টমের। একটু জল পেলে ভাল হত। কিন্তু কে দেবে।

অনেক পথ পেরিয়ে ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। এ অঞ্চলটা বেশ ফাঁকা। দোকান-পাট বিশেষ নেই। ঠিক শহর বলা যায় না। অনেকটা শহরতলীর মত। গাঁ অথচ শহর। প্রত্যেকের বাড়ীর সামনে লাগোয়া বাগান-পুকুর।

একটা বাড়ীর সামনে অনেকটা বড় বাগানে অনেক নারকেল গাছ দেখতে পেল টম। সেই গাছ দেখে টমের তেষ্টা আরো বেড়ে গেল। সে এক লাফে সেই পাঁচিলে উঠে ডাব পাড়তে গেল। আর যাবে কোথায়। গ্রীমস্ সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে নামিয়ে মারতে শুরু করলো। পাশ দিয়ে একজন আইরিস্ মহিলা চলে যাচ্ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন : আহা ! ছেলেটাকে অমন করে মারছো কেন ?

: আর বলবেন না। ব্যাটা ডাব চুরি করতে গাছে উঠতে যাচ্ছিলো।

টম বললো : আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি জল খাব।

আইরিস্ মহিলা বললেন : আহা বেচারী। অতটুকুন ছেলে। তেষ্টা পেয়েছে। না হয় একটা ডাব পেড়ে খেত। তা'বলে এমন ভাবে মারতে হবে।

গ্রীমস্ রেগে গিয়ে বললো : এ আমার লোক। আমি যা' খুশি করবো।

: তা' কর। আমি বাধা দেব না। কিন্তু কচি ছেলেটা। দেখলে কষ্ট হয়। ভদ্রমহিলা আর কোন কথা না বলে পাশের গলিতে ঢুকে গেলেন। টম একটুক্ষণ অবাক হয়ে ঐ মহিলার দিকে চেয়ে থাকলো।

এমন মিষ্টি কথা আর ব্যবহার সে জীবনে কারো কাছে পায় নি। আজও পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে, সেটা টমের অজানা। টমের চোখে এই পৃথিবীটা অত্যন্ত কদর্য এবং কঠোর। কিন্তু আজকে তার আরেকটা দিক জানা হল। সে অনেকক্ষণ, চলে যাওয়া ঐ মহিলার পথের দিকে চেয়ে রইলো আর ভাবতে লাগলো, যে যদি আরেকবার তার দেখা পাওয়া যেত। কিম্বা তার কথা শুনতে পেত।

গ্রীমস্ রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে পথ চলতে লাগলো আর টমকে বকতে লাগলো। টম আজকাল গ্রীমস্-এর কথায় বিশেষ কান দেয় না। জানে মার তার কপালে লেখাই আছে।

এই ভাবে আরো কিছু পথ এগিয়ে আসার পর, গ্রীমস্ হঠাৎ বললো ঃ এই টম, আমরা জমিদার বাড়ীতে এসে গেছি। এখানে এ জমিদারের খুব নাম ডাক আছে। ওখানে আমার কথা শুনে না চললে, আমি কোন কথা শুনবো না। একেবারে খুন করে ফেলবো। সাবধানে আমার কথা শুনে চলবি। কাজটা পাকা হলে বেশ কিছু পয়সা পাওয়া যাবে।

মস্ত বড় ফটকের সামনে দারোয়ান দাঁড়িয়ে। গ্রীমস্ তাকে সেলাম জানাতে সে ফটক খুলে দিয়ে এক হাঁক্ ছাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এক চাকর এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো।

টম দেখলো সেই লোকটা। যে খবর দিতে গিয়েছিল। চাকরটা তাদের পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে চললো।

এত বড় বাড়ী টম জীবনে দেখেনি। বিরাট বাগান আর পুকুরের মাঝখানে এই মহল দাঁড়িয়ে। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। টম বাগান দেখতে দেখতে চাকরটার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কত রকম সব বাহারী পাতার গাছ আর ফুলে ভরা। দেখলেই ছিঁড়ে আনতে ইচ্ছে করে। টম বার বার তার ইচ্ছেটাকে সামলে নিতে লাগলো। বাগানে আম, জাম আর কাঁঠালে ভরা। পুকুরের জল দেখে টমের তেষ্টা যেন আরো বাড়লো। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই।

বাড়ীর পেছনে এসে চাকরটা গ্রীমস্‌কে কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগলো।

ছাইয়ের গাদা পরিষ্কার করতে হবে। নর্দমা পচা পাঁকে ভরা। ওটাও পরিষ্কার চাই। তারপর বাগান, পুকুর, আস্তাকুঁড় এবং সবশেষে সমস্ত ঘর ও দরজা-জানালা। আগাগোড়া বাড়ীটাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। জমিদারের হুকুম।

গ্রীমস্ কাজ বুঝে নিতে, চাকরটা অন্যদিকে চলে গেল। গ্রীমস্ টমকে বললো ঃ বুঝলি তো। যা' এবারে ড্রেনে নেমে গিয়ে কাদা তোল। টম আর কি করে। ড্রেনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একেবারে নীচে নেমে গিয়ে পচা কাদা ওপরে তুলতে লাগলো। এই ভাবে কাদা তুলতে তুলতে টমের সমস্ত গায়ে পচা কাদা মেখে গেল এবং তাকে ভূতের মত দেখাতে লাগলো।

দোতালায় একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে টমের কাজ দেখছিলো। সে টমের ঐ ভূতের মত চেহারা দেখে হেসে লুটিয়ে পড়লো। টম কাজ ফেলে ওপরে তাকালো। বাঃ! ভারী মিষ্টি মেয়েটিতো। টম ও হাসল।

ড্রেনের কাজ শেষ করে টম নর্দমায় হাত লাগালো। নর্দমা পরিষ্কার করতে করতে সে একটি ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এমন সাজানো-গোছানো ঘর সে জীবনে দেখেনি। জাফরি কাটা নীল পরদা তুলে সে একবার ঘরখানা। ভাল করে দেখে নিল। তারপর আরো সব ঘর দেখবার লোভে সে হাতের ঝাঁটা ফেলে দোতালায় উঠে এলো।

দোতালায় মেয়েটি তখন নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। টম তখন সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। এবং ঘরের পরদা তুলে ভাল করে দেখতে লাগলো। সাজানো ঘর। মেঝেতে ফুলকাটা কার্পেট পাতা। দেওয়ালে রকমারী ছবি। শ্বেতপাথরের নানা টেবিল। তা'তে হরেক রকম বাহারী ফুল। আর তারই মাঝখানে ছোট্ট একটি খাটে ফুলের মত নরম একটি বিছানায় সেই মেয়েটি ঘুমিয়ে।

টম কখন যে ঘরে ঢুকে পড়েছে নিজেই জানে না। সে, ঘরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলো। তারপর বড় একটি আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠলো। টম ভাবলো, তারই মত আরেকটি ছেলে কাল ভূতের মত চেহারা নিয়ে ঐ ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

যেই ভাবা, অমনি টম ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। আর মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যেতে, সে' ও টমের ভূতের মত চেহারা দেখে ভয়ে চেঁচাতে লাগলো। টম আর দাঁড়ালো না। সে সঙ্গে সঙ্গে চো-চাঁ দৌড় লাগালো। বাগানে আসতেই দেখলো চাকরটা দৌড়ে আসছে তাকে ধরতে। টম একবার পেছনে তাকিয়েই ছুটতে শুরু করলো। পেটে ক্ষিদে। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তবু থামা চলবে না। টম ছুটছে-ছুটছে-ছুটছে। পেছনে মালী ছুটে এলো। জমিদারের সরকার বাবুও ছুটে এলেন, টমকে ধরতে। সাত মহলা বাড়ীর পেছনে গ্রীমস্‌ কাজ করছিল। তার কানেও কথাটা গেল। সে আস্তাকুঁড় থেকে ছুটে এলো টমকে ধরতে। সবার মুখেই এক কথা: চোর! চোর! চোর! পালাচ্ছে। বাড়ীর সকলেরই ধারণা হয়েছে, টম দোতালায় গিয়ে কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। টম ছুটতে ছুটতে পুকুর পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে একেবারে বাড়ীর শেষ-সীমানায় চলে এলো। তারপর প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এক লাফ। এত বড় লাফ টম জীবনে দেয়নি। বাইরে এসে টম হাঁপাতে লাগলো। কি করবে ভেবে পেল না। তখনও সে বাড়ীর চাকর, মালী, দারোয়ান এবং সরকার বাবু পেছনে পেছনে ছুটে আসছেন। টম দিশেহারা। সে সোজা সড়ক ছেড়ে বাঁ-হাতের গলি পথ ধরলো। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। ওদের চিৎকার শুনে, সে গলির অন্য দোকানদারেরা টমকে ধাওয়া করলো ধরবার জন্যে। ওরাও ধরে নিল যে টম জমিদার বাড়ী থেকে নিশ্চয়ই কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। টম ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলো। মরি-বাঁচি করে সেই গলিপথ শেষ করে, একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর এলোমেলো খানিকটা হেঁটে একটা গাছ তলায় বসে পড়লো।

এখন আর পেছনের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। টম বুঝলো ওরা পথ হারিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। টম অনেকক্ষণ সেই গাছতলায় বসে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে হাঁটতে লাগলো।

টমের কাছে এ জায়গাটা খুব আশ্চর্য করে দিল। এমন অদ্ভুত জায়গা সে জীবনে দেখেনি। বড় বড় রকমারী গাছ। ঘন ঘন আবছা অন্ধকারে ডাল-পালা জড়ানো। ফালিকাটা রোদ, পাতার ফাঁক দিয়ে নীচে এসে পড়েছে। জায়গাটা ভয়ানক নির্জন। হরেক রকম পাখীর ডাকে এ দিকটা মুখর। টম অবাক হয়ে এই সব দেখতে দেখতে বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলো। অনেক পথ হেঁটে আসবার পর, টম সামনে একটা পাঁচিল দেখতে পেল। সে সেটা অনেক কষ্টে পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এ অঞ্চলটা আরো অদ্ভুত। বন, বাড়ী-ঘর, গাছ-গাছালী কিচ্ছু নেই। একেবারে টানা মাঠ বহুদূর চলে গেছে। কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে না। মাথার ওপর বিরাট নীল আকাশ। পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এ অঞ্চলে একটাও মানুষ নেই দেখে টম অবাক হল। অথচ কি সুন্দর জায়গা। এত আলো এত হাওয়া আর এতবড় খোলা মাঠ টম জীবনে দেখেনি। টম, যে অঞ্চলে বাস করে সেটা একটা এঁদো গলি। বস্তির লোকেরা সেখানে বাস করে। কারখানার অনেক লোক সেই বস্তির বাসিন্দা।

খোলা মাঠ ধরে এগিয়ে আসতে আসতে টম সামনে একটা উঁচু পাহাড় দেখতে পেল। এতক্ষণ নজরেই আসে নি। টম ভাবলো, ঐ পাহাড়টার ওপরে উঠলে কেমন হয়। পাহাড়টা আগাগোড়া পাথুরে নয়। মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গাছ-পালাও আছে। বেশ একটা ছায়া ছায়া ভাব। টমের খুব ইচ্ছে হতে লাগলো, ঐ পাহাড়ের ওপাশে কি আছে সেটা দেখতে হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। টম ধীরে ধীরে ঐ পাহাড়ে হাত রেখে রেখে নানা পাছ-পালার ছায়ায় ছায়ায় ওপরে উঠে এলো। একেবারে চুড়োয় দাঁড়িয়ে সে বহুদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলো। পাহাড়ের এ পাশটাও ঢালু হয়ে একটা বড় ক্ষেতে মিশে গেছে। তারপাশে একটা ছোট্ট নদী কুলকুল বয়ে যাচ্ছে। এবং সেই নদীর পাশে পুতুলের মত সাজানো একটি ছোট্ট কুটির। টমের মনে হল, ঐ কুটিরে নিশ্চয়ই কেউ বাস করে। মাথার ওপরে টানা রোদ। পেট ক্ষিদেয় জ্বলছে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। এমন অবস্থায়-

পেছনের এত পথ পেরিয়ে, নিজেদের বস্তিতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং যত কষ্টই হোক না কেন, টম ঠিক করলো যে, সে ঐ কুটিরেই যাবে। আর কিছু না হোক, একটু বিশ্রাম, একটু খাওয়া আর জলতো মিলবে। টম ঢালু পথে নামতে শুরু করলো। এবং শেষে অনেক পথ পার হয়ে, একটা পুলের সামনে এসে দাঁড়ালো। যে পুলটা সেই ছোট্ট কুটিরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কুটিরের সামনে এসে টম দেখলো একজন বুড়ী বসে। টম বললো: আমার খুব তেষ্ঠা পেয়েছে। আমাকে এক গ্লাস জল দিন। টম কথা বলতে বলতে সেখানেই বসে পড়লো।

বুড়ীটা টমকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলো। তারপর ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে এক গ্লাস গরম দুধ আর জল এনে বললো: এই জলে হাত মুখ ভাল করে ধূয়ে নাও। তারপর গরম দুধটা খাও।

টম আর কোন কথা না বলে, হাত-মুখ ধূয়ে গরম দুধটা খেয়ে নিল।

বুড়ীটা বললো: কোথায় থাকো।

টম বললো: অনেকদূরে। শহর ছাড়িয়ে একটা বস্তিতে।

: মা আছেন?

: না। মারা গেছেন।

: বাবা।

: তিনি ছিলেন। তবে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

: বুড়ীটা আহা বেচারী। টমের কথায় দুঃখ প্রকাশ করলো? এবং পরে বললো: তবে থাকো কার কাছে।

: গ্রীমসের কাছে।

: কি কাজ কর।

: গ্রীমসের সঙ্গে কারখানা ঝাড়ুদি। তা'তে যে দুটো পয়সা পাই, গ্রীমস্ নিয়ে নেয়। আমাকে দেয় না।

: তুমি এখানে এলে কি করে। এখানে তো বড় একটা কেউ আসতে পারে না।

টম বললো ঃ সে অনেক কথা।

ঃ কি কথা আমাকে বলো।

টম বলতে লাগলো ঃ আমি আর গ্রীমস্ আজকে গিয়েছিলাম জমিদার বাড়ী ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতে। সেখানে একটি ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার সারা শরীরে পচা কাদা লেগে কাল ভূতের মত হয়ে যায়। আমি সেই অবস্থায় একটি ছোট্ট মেয়ের ঘরে ঢুকি এবং আয়নায় আমার চেহারা দেখে আঁৎকে উঠি। ঘরে সেই ছোট্ট মেয়েটি ঘুমোচ্ছিলো। আমার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে ঘুম থেকে উঠেই 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করতে থাকে। তখন সবাই আমাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসে।

ঃ কে কে ছুটে এসেছিল।

ঃ বাড়ীর চাকর, মালী, দারোয়ান এবং সরকার বাবু। তারা সবাই ভেবেছিল আমি কিছু চুরি করে পালাচ্ছি। কিন্তু আমি কিছুই চুরি করিনি।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আর কি। আমি প্রাণের দায়ে ছুটতে শুরু করলাম। এই ভাবে জমিদার বাড়ী ছাড়িয়ে পহরের পথ ধরলাম। তারপর একটা সরু গলি। তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেই বন পার হয়ে দেখলাম একটা উঁচু পাহাড়। আমি অনেক কষ্টে সেই পাহাড়ের উঠলাম। সেই পাহাড়ের ঢালুতে দেখলাম, একটা বড় ক্ষেত। সবুজে ভরা। আমি সেই ক্ষেত পার হয়ে পুলে উঠলাম। তারপর এই বাড়ীতে। কিন্তু আমি চোর নই। আমি সেই জমিদার বাড়ীতে কিছুই চুরি করি নি।

ঃ তা'হলে এত কষ্ট না করে, ধরা দিলেই তো পারতে।

ঃ না। তা'হলে ওরা আমাকে মারতো। বিশেষ করে গ্রীমস্ আমাকে মেরেই ফেলতো।

ঃ বেশ ! তোমার সব কথা শুনলাম। এবারে সামনের ঐ নদীতে স্নান করে এসো। তা'তে তোমার শরীরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর শরীরটাও ঠাণ্ডা হবে। আমি তোমার খাবার জোগাড় করি।

তুমি খেয়ে-দেয়ে এখানে বিশ্রাম করো। তারপর লোক দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

টম বললো ঃ কোথায় ?

ঃ যেখান থেকে এসেছ।

ঃ কিন্তু আমি আর সেখানে ফিরতে চাই না। গ্রীমস্ আমাকে মারে। ও'কে আমার একটুও ভাল লাগে না। আর তা' ছাড়া জায়গাটাও বস্তি। এমন খোলা-মেলা নয়।

ঃ কিন্তু তা' বলে আমি তোমাকে এখানে রেখে দিতে পারি না। কোন জায়গা ভাল না লাগলেও, তাকে মনের মত করে তৈরী করে নিতে হয়। আর মানুষ সম্পর্কেও সেই কথা। গ্রীমস্কে তোমার ভাল লাগে না। সেটা বড় কথা নয়। তুমি আগে নিজেকে তার মনের মত হবার চেষ্টা করবে। তা'হলেই জায়গা এবং মানুষ এ দুই ভাল লাগবে। যাই হোক, তুমি এখন নদীতে স্নান করে এসে খাওয়া-দাওয়া করে নাও।

টম আর কি করে। সে নদীতে স্নান করতে চলে গেল।

নদীর জলে হাত দিয়েই টম চমকে গেল। আঃ! কি ঠাণ্ডা! এমন ঠাণ্ডা জল টম জীবনে দেখে নি। টম ধীরে ধীরে জলে নামলো। পরে সাঁতরাতে শুরু করলো। সাঁতরাতে সাঁতরাতে টম অনেক পথ পার হয়ে এলো। এখন নদীর দু'পাশের ক্ষেত বা বন কিছুই নজরে পড়ে না। সেই কুটিরটাও আর দেখা যাচ্ছে না। এখন শুধু জল, জল, আর জল। টমের গা' থেকে সমস্ত নোংরা আর ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার শরীর এখন ঝক্ঝকে পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এখন টমকে দেখলে কেউ আর চিনতেই পারবে না।

টম সাঁতরাতে সাঁতরাতে দেখলো, একদল মাছ তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। টম তাদের সঙ্গে চলতে লাগলো। সে জলের নীচে তাকিয়ে দেখলো, আয়নার মত স্বচ্ছ জল। অনেক নীচে একঝাঁক বড় মাছ সাঁতরে যাচ্ছে। টম এক ডুবে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হল।

তারা বললো ঃ তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। আমরা অনেক দূরে যাব।

টম বললো ঃ কোথায় ?

তারা বললো ঃ সাগরে।

টম বললো ঃ বেশ ! তাই চলো। আমি ও তোমাদের সঙ্গে সাগরে যাব। গ্রীমস্ আর ঐ কুটির পেছনে পড়ে থাক। ওখানে আর আমি ফিরবো না। আমি এখন থেকে তোমাদেরই একজন। তোমাদেরই সাথী। টম খুশি মনে সাঁতরাতে লাগলো।

এদিকে কুটিরের বুড়ীটা টমের জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল তবুও টমের দেখা নেই। বুড়ীটা ভাবলো, ছেলেটা সাঁতার জানে তো ? না হ'লে ডুবে যাবে। নদীতে স্রোতের যা' টান। বুড়ীটার ধীরে ধীরে চিন্তা বাড়তে লাগলো। তখন আর স্থির থাকতে না পেরে টমকে ডাকতে ডাকতে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। নদীতে কেউ নেই। কুল কুল বয়ে যাচ্ছে নদী। বুড়ীটা অবাক হল। তারপর খুঁজতে লাগলো নদীর ধার ঘেঁসে ঘেঁসে। যদি টমকে পাওয়া যায়। বেচারী এক পেট ক্ষিদে নিয়ে বেরিয়েছে। বুড়ীটার চোখে জল আসতে লাগলো। কিন্তু না। সন্ধ্যে হয়ে এলো। আশে-পাশে অন্ধকার নেমে আসছে। টমকে পাওয়া গেল না।

বুড়ীটা এক বুক কান্না নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

ওদিকে জমিদার বাড়ীতেও গোলমাল বেধে গেছে। জমিদার বাড়ীর সকলে টমকে ধরবার জন্যে কিছু পথ ছুটে এসেছিল। তারপর তাকে ধরতে না পেরে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেছে। বাড়ী গিয়ে জানতে পারলো যে টম আসলে কিছুই চুরি করেনি। সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠে ছিল। আর সেই শব্দে জমিদারের মেয়ে এলির ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে তার ঘরে ভূতের মত চেহারা একটি ছেলেকে দেখে ভয়ে 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করে ওঠে। আর তখনই জমিদার বাড়ীর সকলে টমকে চোর ভেবে তাড়া করে। টম নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পালাতে থাকে।

জমিদার স্যার জন ঘটনা শুনে বাড়ীর সকলকে ধমকাতে থাকেন। পরে গ্রীমস্‌কে বললেন ঃ তোমার কোন ভয় নেই। তুমি বাড়ী গিয়ে

বিশ্রাম করো। টম পালিয়ে কোথায় আর যাবে। একটু পরেই ফিরে আসবে। ফিরে এলে দারোয়ান দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রীমস্ স্যার জনকে সেলাম জানিয়ে চলে এলো।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলো গ্রীমস্। কিন্তু টমের দেখা নেই। গ্রীমস্ টমের ওপর বিরক্ত হতে লাগলো। ভাবতে লাগলোঃ ছেলেটা থেকেও জ্বালিয়েছে। এখন না থেকেও জ্বালাচ্ছে। সে সারারাত জেগে কাটালো। তারপর ভোর বেলায় আবার জমিদার বাড়ীতে ছুটলো।

জমিদার স্যার জনও চিন্তিত। টম সেখানেও ফেরেনি। জমিদার বাবু ভাবলেন সামনেই বিরাট বন। সাপ, বাঘ-ভাল্লুক সব বাস করে। ছেলেটা হয় সেই বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে। নতুবা কোন হিংস্র পশু তাকে মেরে ফেলেছে। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। বিনা দোষে ছেলেটা মারা যাবে, এ হতেই পারে না। একটা খোঁজ করা দরকার। তিনি নিজে শিকারীর পোষাক পরলেন। তারপর লোকজন ডেকে বাঘা বাঘা সব শিকারী কুকুর নিয়ে বনের পথ ধরলেন। জমিদারের মেয়ে এলি কাছে এসে দাঁড়ালো। তার চোখেও জল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললোঃ টম কোন দোষ করে নি বাবা। সে কিছুই চুরি করেনি। দোষ আমারই। আমিই ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম।

জমিদার নিজের মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেনঃ তুমি ঘরে যাও মা। আমি এখুনি টমকে ধরে নিয়ে আসবো।

বনের মধ্যে টমকে ভাল করে খোঁজা হতে লাগলো। পাঁচ পাঁচটা শিকারী কুকুর ঐ ঘন অরণ্যে হন্যে হয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা বিরাট পাঁচিলের কাছে এসে কুকুর গুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। জমিদার বাবু তাঁর দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। সেখানে তিনি কিছু আঁচড়ানো দাগও দেখতে পেলেন। তাঁর ধারণা হল ছেলেটা এই পথেই পালিয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দল-বল নিয়ে পাঁচিল টপ্কাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বয়সের জন্যে পারলেন না। শেষে অনেক খুঁজে সেই বনের এক কোনে একটা গেট্ দেখতে পেলেন। এবং গেট্ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সামনেই ধূ ধূ মাঠ। কুকুর গুলো সেই মাঠের মধ্য দিয়ে সাঁ সাঁ ছুটতে লাগলো। জমিদার বাবুও এগুতে লাগলেন। কি হয় কি হয় ভাব। বেশ কিছু পথ টানা এগিয়ে এসে, কুকুর গুলো একটা পাহাড়ের গায়ে এসে থামলো। জমিদার বাবু ও থামলেন। তারপর কুকুরগুলো ঐ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে একটা ছোট্ট কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। জমিদারবাবুও অনেক কষ্টে সেই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তাঁর লোকজন নিয়ে সেই কুটিরের সামনে এলেন।

জমিদার বাবুকে দেখেই আগের বুড়ীটা কুটিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। জমিদারবাবু বললেন ঃ এখানে কি কোন ছেলে এসেছিলো ? আমাদের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে।

বুড়ী বললো ঃ হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! গতকাল একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এখানে এসেছিল। এসেই বললো ঃ জল। আমি তাকে দুধ খেতে দিলুম। জল দিলুম। তারপর তাকে বললাম সামনের নদী থেকে স্নান করে আসতে। ওর জন্যে খাবার ও আমি তৈরী করে রেখেছিলুম। কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। বুড়ীটা কথা বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করে দিল। জমিদারবাবু অনেক কষ্টে তাকে থামালেন। পরে তিনি তাঁর দল বল ও কুকুর গুলো সঙ্গে নিয়ে নদীর পথ ধরলেন। বুড়ীটাও কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে চলতে লাগলো। জমিদারের সঙ্গে যে সব লোকজন চলেছে তাদের সকলের মুখ ভার। কারণ তারাই টমকে তাড়া করেছিল। টমকে পাওয়া না পেলে জমিদার বাবু তাদের কি শাস্তি দেবেন কে জানে।

জমিদারবাবু ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। নদীটা নজর দিয়ে দেখলেন। উত্তাল তরঙ্গ বইছে। বড় বড় সব ঢেউ। তিনি বুঝে নিলেন যে এ নদীর গভীরতা অনেক। সত্যি কেউ এখানে নামলে আর বাঁচবে না। ছেলেটা যদি এখানে নেমে থাকে তবে ডুবে গেছে।

বুড়ীটা কাঁদতে কাঁদতে বললো ঃ ছেলেটাকে কি আর পাওয়া যাবে না বাবা।

জমিদারবাবু বললেন ঃ দেখছি কি করা যায়।

জমিদারবাবু সেই নদীর পাড় ধরে এগুতে লাগলেন। অনেক পথ এগিয়ে এসে সামনে আবার একটা বন দেখতে পেলেন। ভাবলেন, এই বনেও ছেলেটা হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার বা সাপও কাটতে পারে। সুতরাং বনটা ভাল করে দেখা দরকার। তিনি লোক লাগালেন। বললেন : ভাল করে খোঁজো। দেখো পাওয়া যায় কিনা।

লোকজন বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে টমকে খুঁজতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলো। কিন্তু পাওয়া গেল না। জমিদারবাবু শুনে হতাশ হয়ে ভাবলেন : তবে কি জলেই ডুবলো ছেলেটা। তিনি আবার নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলেন।

এক জায়গায় এসে তিনি আঁৎকে উঠলেন। লোকজন বলে উঠলো : কাদা লাগানো প্যাণ্টটা যখন এখানেই পড়ে আছে, তখন বুঝতে হবে যে ছেলেটা নদীতেই ডুবে গেছে। সুতরাং আমাদের আর করবার কিচ্ছু নেই। জমিদারবাবু তবু শুনলেন না। তিনি আরো ভাল করে খুঁজতে বললেন। লোকজন খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সত্যিই টমকে আর পাওয়া গেল না। তখন পড়ন্ত বিকেল। সারাদিন ধরে টমকে খোঁজা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না। সবাই ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় বসে পড়লো। কুকুর গুলো জিভ্ বার করে হাঁপাতে লাগলো। জমিদারবাবুও বসলেন। বুঝলেন যে আর পাওয়া যাবে না। শেষে তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

বাড়ীর সকলেই জানালো যে টমকে পাওয়া যায় নি। কেউ বললো : জলে ডুবছে। আবার কেউ বললো জানোয়ারে বা সাপে কেটেছে। বাড়ীর সবাই দুঃখ পেতে লাগলো। সকলেই বলতে লাগলো : দেখো! সামান্য ভুলের জন্যে কত বড় একটা অঘটন ঘটে গেল। টমকে চোর বলে তেড়ে যাওয়াটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

জমিদারবাবু বাড়ী ফিরতেই, তাঁর মেয়ে এলি সামনে এসে দাঁড়ালো। কাঁদো কাঁদো ভাব। সে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো : টমকে পাওয়া গেল না বাবা!

জমিদারবাবু মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: ভয় কি মা। সময় হলেই ও ফিরে আসবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা। পরে তিনি সরকার মশাইকে ডেকে বললেন: আমি ছিলুম না বলেই এই অঘটনটা ঘটলো। আমি থাকলে কিছুতেই ঘটতে দিতুম না। ছেলেটা তো আর সত্যিই চুরি করে নি। আগেই ও ভাবে তাড়া করে যাবার কী দরকার ছিল। বেচারী মারের ভয়ে ছুটতে শুরু করেছে। তারপর কি হল কে জানে।

কেউ যেমন জানে না, তেমন টম নিজেও জানে না যে সে নানা রঙ্গীন মাছের সঙ্গে কোথায় ভেসে চলেছে। এখানে স্রোতের টান খুব। মাছদের সঙ্গে টমও সোঁ সোঁ জলের নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্রোতের টানে তার গা থেকে সব ময়লা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এমন কি তার শরীরের খোলসটাও ধীরে ধীরে খুলে গেল। এবং একটি ছোট্ট টমেতে পরিণত হল। তখন তার শরীরটা এত ছোট হয়ে গেল, যেন দেখলে মনে হবে একটা পুতুল। সাঁতার দিতে দিতে টম তার কানের দু'পাশে হাত দিল। দেখলো, ভারী সুন্দর রূপোলী দুটো পাখনা গজিয়েছে। টম খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো। সে এইটাই হতে চাইছিলো। তার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হল। সে এতদিনে জলপরী হতে পেরেছে। সে যে কখন এবং কেমন করে জলপরী হয়ে গেল, সেটা সে নিজেও জানে না। তবে নানা রঙ্গীন মাছের সঙ্গে স্রোতে গা' ভাসিয়ে চলে যেতে তার ভারী মজা লাগছিলো। নদীর গভীরে যে এত মজা আছে টমের জানাই ছিল না।

টম এখন আর সে টম নেই। কেউ দেখলে চিনতেও পারবে না। তার এখন আর মনেও নেই যে, তার সারা গায়ে কাদা মাখা ছিল। সে স্নানের জন্যে নদীতে এসেছিল। সে গ্রীমসের কাছে থাকতো। যত নর্দমা আর নোংরা, ঝাড়ু দিয়ে বেড়াতো এবং গ্রীমসের হাতে মার খেত। গ্রীমসের মারের দাগও আর টমের শরীরে নেই। সে খোলস খুলে ফেলেছে। এমন কি সেই জমিদার বাড়ীর মেয়ে এলি বা তার পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের কথাও সে ভুলে গেল। তবে মনের দুষ্টুমিটা ঠিকই রইলো। তার ইচ্ছে হল,

এই নদীর গভীরে নেমে গিয়ে কি কি আছে সব দেখবে। তাই সে আরো নীচে নামতে শুরু করলো। নীচে নামতে নামতে শেষে একটা ঘেরা-টোপের মধ্যে এসে পড়লো। সেখানে নানা রঙ্গীন মাছের মেলা বসেছে। ছোট, বড়, মাঝারী সবাই এক সাথে খেলা করছে। টম অবাক। সাগরের নীচে যে এত চমৎকার জায়গা আছে, সেটা সে কল্পনাই করতে পারে নি। শ্যাওলা ঘেরা সেই ঘেরা-টোপের পাশে দাঁড়িয়ে টম ওদের খেলা দেখতে লাগলো। টম এখন ওদের কথাও বুঝতে পারে। ও জেনে গেছে যে, সাগরের নীচে যত জীব জন্তু, পোকা-মাকড়, মাছ বা গাছ-গাছালী আছে সবাই কথা বলে। এমন কি এখানকার শ্যাওলারাও কথা বলে। এবং এই সব কথা টম বুঝতে পারে। টম আপন মনে ওদের খেলা দেখছিল। হঠাৎ একটা রঙ্গীন ফুটফুটে মাছ টমের কাছে এগিয়ে এসে বললোঃ কী খোকা! তুমি এখানে কি করে এলে?

টম বললোঃ সাঁতার দিতে দিতে।

রঙ্গীন মাছটা বললোঃ আমাদের সঙ্গে খেলবে এসো।

টম বললোঃ আমাকে এখন অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তোমরা খেলা কর। আমি ঘুরে আসি।

এবারে টম অতল জল থেকে ওপরে ভেসে উঠতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে একেবারে নদীর ওপরে ভেসে এলো। টম এখন স্রোতে গা ভাসিয়ে অকুল নদীর দিকে চলেছে। হঠাৎ নদীর পাড়ে একটা গর্ত দেখে টমের কেমন যেন কৌতুহল হল। ভাবলো দেখে আসি কি আছে ওখানে। এসে দেখলো, একটা অদ্ভুত পোকা ওখানে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। টম অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। ভাবলো এটা আবার কি রে বাবা।

টমকে দেখে পোকাটা ধীরে ধীরে রাগে ফুলতে লাগলো এবং শেষে ফেটে গেল। টম ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর দেখলো সেই খোলেসের মধ্যে থেকে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রজাপতি বেরিয়ে এলো। টম বেবাক-অবাক। এমন জিনিষ সে আগে কখনো দেখেনি। টম দেখলো, প্রজাপতিটা দেখতে ভারী সুন্দর। সারা গায়ে রামধনুর নানা রং

ছড়িয়ে। পিঠের পাশে রেশমের মত-হালকা পাখা। লাজুক-লাজুক চোখ। টমের দিকে তাকিয়ে আছে। টম আনন্দে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু ধরা গেল না। প্রজাপতিটা ফরফরিয়ে উড়ে গিয়ে টমকে ঘিরে দু'পাক দিয়েই বললোঃ আমাকে এখন ধরা যাবে না ভাই। আমি এখন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবো। গাছের পাতায় পাতায় ছায়ায় ছায়ায়, কত রঙীন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবো। কত নতুন নতুন জিনিষ দেখবো। তুমি আমার জন্যে চুপটি করে এখানে বসে থাকো। আমি ঘুরে এসে তোমাকে নানা দেশের গল্প শোনাবো।

প্রজাপতিটা কথা বলতে বলতে উড়ে গেল। টম আর কি করে। সে দেশ-বিদেশের গল্প শোনবার লোভে ওখানেই বসে রইলো।

অনেক রাতে প্রজাপতি ফিরে এসে টমের পাশে বসে সারাদিনের গল্প শোনাতে লাগলো। দেশ-বিদেশের বিচিত্র সব গল্প। টম মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো।

প্রজাপতির সঙ্গে টমের খুব ভাব হয়ে গেল। ওরা দু'জনেই এক সঙ্গেই থাকে। নানা দেশের গল্প করে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে, যখন সাগরে সূর্যের সোনালী রং ছড়িয়ে পড়ে, তখন টম ঐ প্রজাপতির পাশে এসে বসে। আর প্রজাপতি তার প্রতিদিনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তাকে শোনাতে থাকে।

টমের দিনগুলো এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিলো।

একদিন টম নদীর পাড়ে প্রজাপতির জন্যে চুপচাপ বসে আছে। প্রজাপতি ফিরে এসে তাকে গল্প শোনাবে। এমন সময় নদীর মধ্যে উথাল-পাথাল ঢেউ তুলে কিছু জন্তুকে সে এগিয়ে আসতে দেখলো। টম ভাবলো, প্রজাপতির আসতে এখনো দেরী আছে। কাজেই দেখে আসা যাক ওগুলো কি। টম সোঁ সোঁ করে সাঁতার কেটে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। টমকে দেখেই বড় জন্তুটা ছোটদের বললোঃ তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসো। সামনে যেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটাকে খেতেই হবে। কথা শুনে টম ঘাবড়ে গেল। ভাবলো বলে কি জন্তুটা। টম তাড়াতাড়ি একটা জলপদ্মের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। বড় জন্তুটা অনেকক্ষণ টমকে দেখে

বললো : না। না। এটা অনেকটা মানুষের মত দেখতে। একে খাওয়া যাবে না। চলো আমরা আবার সাগরে ফিরে যাই।

ওরা সাগরের দিকে চলতে শুরু করলো। টম অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আবার সাঁতার দিতে শুরু করলো। সাঁতার দিতে দিতে টম প্রজাপতির কথা ভুলেই গেল। টম এবারে সাগরের দিকে ছুটতে লাগলো। শুনেছে সামনেই সাগর। বিরাট তার ঢেউ। একুল-ওকূল দেখা যায় না। টম ভাবলো একবার সাগরটা দেখে আসা যাক। টম একা একা অনেক পথ সাঁতরে গেল। কয়েকটা দিন ও কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যার দিকে সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে এলো। এত অন্ধকার যে জলে রং গাঢ় কাল হয়ে গেল। পথ কিছু দেখা যায় না। টম তার মধ্যেই সাঁতার দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে নদীতে ঝড় উঠলো। উথাল-পাথাল ঢেউ। এত বড় বড় ঢেউ টম জীবনে দেখে নি। সমস্ত জল তোলপাড় করতে লাগলো। কোথায় যেন বাজ পড়ল। আকাশে আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল। দেখতে দেখতে নদীর স্রোত বাড়লো। টম সেই স্রোতে গা' ভাসিয়ে দিল। টম দেখলো নানা ধরণের মাছেরাও গা' ভাসিয়ে সাগরে চলেছে। টমকে দেখে তারা বললো : ঝড় বৃষ্টিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। নদীর জল ফুলে উঠেছে। চলো। চলো। দাঁড়িও না। সাগরে যাবার এইতো সুযোগ।

টম বললো : চলো। আমিও সাগর দেখতে যাচ্ছি।

জন্তুরাও এগিয়ে এলো। বললো : চলো। চলো আজ আমরা সবাই সাগরে যাব। দুনিয়াটা ঘুরে আসবার এমন সুযোগ আর আসবে না।

টম ঘুরে তাকিয়ে দেখলো তিনটে ফুট ফুটে মেয়েও চলেছে। টম বললো : তোমরা কারা ?

মেয়েরা বললো : আমরা জল পরী। সাগরে যাচ্ছি।

ওরা সকলে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে সাগরে চলতে লাগলো। ওরা এই ভাবে অনেক পথ পার হয়ে চলে এলো। শেষে এক জায়গায় এসে

টম দেখলো যে নানা নদী একজায়গায় এসে মিলে এক বিরাট আকার ধারণ করেছে। সে জায়গার কোন কূল দেখা যায় না। বড় বড় সব ঢেউ গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। টম বুঝলো যে এটা সাগরের মোহনা। টম আবার চলতে স্থরু করলো। শেষে এক জায়গায় একটা পাহাড় দেখতে পেল। টম পাহাড়ের গা' বেয়ে বেয়ে নীচে নামতে লাগলো। এবং একটা গুহার পাশে এসে দাঁড়ালো। টম দেখলো বিরাট আকারের ছুটো বড় মাছ সেই গুহা আগলে বসে আছে। তাদের শরীরটা রূপো দিয়ে মোড়া। মাথায় সিঁছুর লাগানো। অদ্ভুত স্থন্দর দেখতে ছুটি মাছ। টম কাছে এসে দাঁড়ালো। টমকে দেখে একটি মাছ বললো: তুমি কোথা থেকে আসছো?

টম বললো: আমি নদী থেকে।

মাছটি বললো: কেন এসেছো?

টম বললো: সাগর দেখতে।

মাছটি বললো: তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ভাল ছেলে। ছুষ্টুমি কোরো না। এখানে বোসো। এখুনি তোমার সাথীরা এসে পড়বে।

টম অবাক হয়ে বললো: আমার সাথী?

মাছটি বললো: হ্যাঁ! কেন? সারা নদী পথে তুমি কি কোন সাথী পাওনি।

টম বললো: ছু' একজনকে পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা সব হারিয়ে গেছে। মাছটি বললো: তুমি এখানে চুপটি করে বোসো। দেখবে এখুনি সব নানা ধরণের রঙ্গীন জলপরীর দল এসে জুটবে। তোমাকে নিয়ে খেলা করবে। টম একটা বড় পাথরে বসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন জলপরীরা এলো না তখন টম সেই মাছ ছুটোকে বললো: কৈ! আমার খেলার সাথীরা তো এল না। আমি তা'হলে চলি। আবার ফেরার পথে দেখা করবো। একটি মাছ বললো: বেশ! তাই কোরো! ওরা কেন আসছে না বুঝতে পারছি না। তুমি

ছেলে খুব ভাল। আমাদের খুব ভাল লেগেছে তোমাকে। তোমার কথা আমি ওদের বলে রাখবো। তুমি আবার এসো।

টম বললোঃ আমি তা'হলে চলি। টম আবার চলতে সুরু করলো। সাগরটা ভাল করে ঘুরে দেখতে হবে। সাগরের নাম সে আগে অনেক বার শুনেছে। কিন্তু দেখা হয়নি। এবারে যখন সুযোগ এসেছে তখন ছাড়বে না। সবটা ঘুরে দেখবে। টম জোরে জোরে সাঁতরাতে লাগলো।

টম এই ভাবে মাইলের পর মাইল সাঁতরে চলে এল। রাতের পর রাত সে একটানা সাঁতার কাটলো। শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন সাগরের তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলো। এবং এসেই অবাক হল। সাগরেরর ওপরের জগতটা তার অনেকদিন দেখা হয়নি। আকাশে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। বাঁকা চাঁদ। গাছের আগ্ডালের মাথায় উঁকি দিচ্ছে। হাসি হাসি মুখঃ ও যেন টমের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলতে চাইছে। টম অবাক হয়ে ঐ চাঁদকে দেখতে দেখতে একটা বড় পাথরের ওপরে এসে বসলো।

এ পাশটা ভয়ানক নির্জ্জন। গাছ-গাছালীতে ভরা। ঝাউ গাছের ঝিলিমিলিতে বন-জ্যোৎনা ছড়িয়ে পড়েছে। সাগরের জল রূপোর মত চক্‌চকে দেখাচ্ছে। আশ-পাশের বন থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধ আসছে। এ পরিবেশটা টমের খুব ভাল লাগলো। সে অনেকদিন জলের নীচে থেকেছে। এখন এই পাথরটায় বসে বিশ্রাম তার ভালই লাগছে। টম একদৃষ্টে ঐ ফালিকাটা চাঁদের দিকে চেয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর টম দেখলো এদিকের পাড়ে লাল লাল কিছু আলো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। টম ভাবলো ওটা কি দেখে আসতে হবে। সে আবার সাঁতরে এ পাশে এসে বসলো। দেখলো গোটা কয়েক বড় মাছ ঐ আলোর দিকে চেয়ে আছে।

ঘটনাটা কি ঘটে সেটা দেখবার জন্যে টম চুপচাপ বসে রইলো। টম চুপচাপ বসে রইলো। টম দেখলো পাড়ের ওপরে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা মানুষ। এবং তাদের হাতেই ঐ লাল আলো। তারা এদিকে বর্শা

হাতে মাছ ধরতে এসেছে। যে মাছেরা জলে বসে আলো দেখছে তাদের ওরা মারবে। টম একবার ভাবলো, সে গিয়ে ঐ মাছদের সাবধান করে আসে। কিন্তু ভয়ে যেতে পারলো না। তারপরই একজন লোক একটা বর্শা ছুঁড়ে একটি বড় মাছকে ঘায়েল করল। জল রক্তে লাল হয়ে গেল। তোলপাড় সুরু হল। মাছটা বাঁচবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। লোকেরা তাকে টেনে পাড়ে তুলে ফেললো। আর সব মাছ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পালালো। তারপর হঠাৎ একটা লোক ঐ জলে লাফিয়ে পড়ে অতলে ডুবে যেতে লাগলো। সে বোধ হয় সাঁতার জানতো না। মাছ ধরতে গিয়ে এই বিপত্তি হল। লোকটা ধীরে ধীরে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে টমের সামনে চলে এলো। টম বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো যে ঐ লোকটাকে সে চেনে। একদিন সে তার মনিব ছিল। অসম্ভব খাটাতো। নাম গ্রীমস্।

গ্রীমস্‌কে দেখে টমের মুখে আর কথা নেই। সে সোঁ সোঁ সাঁতরে পালাতে লাগলো। বাপরে, ওর হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। আবার মারতে সুরু করে দেবে। খেতে দেবে না। অকারণ খাটিয়ে মারবে। টম সাঁই সাঁই সাঁতরাতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো গ্রীমস্ কি এই জলে এসেও তার মনিব থাকবে, না জলপরী হয়ে যাবে। যদি জলপরী হয়ে যায় তবে খুব ভাল হয়। তা'হলে সে আর টমকে মারবে না। টম একটানা ছুটতে থাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ কেটে কেটে সে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। পেছনে তাকাতে সাহস হয় না তার। এই ভাবে সে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, ছাড়িয়ে অকূলে গিয়ে পড়লো। এখানে সাগর আরো বড়। আরো গভীর। আর উথাল-পাথাল ঢেউ গর্জ্জন করতে করতে ছুটে চলেছে।

টম আনন্দে সমুদ্রের তল দিয়ে চলে যেতে লাগলো। এখানে মাছেরা আরো বড়। আরো সুন্দর। নানা ধরণের মাছের সঙ্গে টমের দেখা হতে লাগলো। তারা বললো : কোথায় চলেছ ?

টম বললো : যেখানে সমুদ্রের শেষ নেই। সেখানে।

মাছেরা বললো ঃ আমরা তোমার সাথী। চলো আমরাও যাচ্ছি।

টম বললো ঃ বেশ! চলো।

আরো অনেক পথ এগিয়ে এসে টম দেখলো একটা বিরটা পাহাড় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। টম দেখে অবাক। এত বড় পাহাড় এখানে এলো কি করে? টম ভাবলো যাই হোক তাহলে এখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক। অনেক পথ সাঁতরে আসা গেছে। এখন আর গ্রীমস্ তাকে ধরতে পারবে না। টম নিশ্চিন্তে পাহাড়ের গায়ে এসে বসলো। চারিদিকে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কোথাও কোন জমি বা সীমানা দেখা যায় না। আকাশ ঘোর অন্ধকার। আশপাশ কুয়াশায় ঢাকা। যেন মেঘের পরে মেঘ জমে আছে। টম ভাবলো এখানে নিশ্চয়ই সে জলপরীদের দেখতে পাবে। টসে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। টম এখানে অনেক ঝিনুক আর শাঁখ দেখতে পেল। টম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। ভাবলো এখানে সে জলপরীদের দেখা পেতে পারে। এমন সময় একটা বিরাট মাছ টমের গায়ে এক ল্যাজের ঝাপটা মেরে চলে গেল। টম প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সেই পাহাড়ে একা বসে কাঁদতে লাগলো। তার ধারণা ছিল এখানে এসে সে জলপরীদের দেখতে পাবে। সে দেখলো দলে দলে মাছেরা সাঁতার দিয়ে চলে যাচ্ছে। টম জনে জনে ডেকে প্রশ্ন করতে লাগলো ঃ তোমরা ভাই জলপরীদের দেখেছ?

মাছের দল বললো ঃ দেখেছি! দেখেছি! তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখানে চুপটি করে বসে থাকো। তারাও আসবে।

টম জলপরীদের আশায় রাতের পর রাত ঐ পাহাড়ে বসে কাটাতে লাগলো। তার ধারণা একদিন সে জলপরীদের দেখা পাবেই পাবে।

টম যখন রাতের পর রাত ঐ পাহাড়ে বসে জলপরীদের আশায় বসে আছে তখন একদিন জমিদারের মেয়ে এলি তার মাষ্টারের সঙ্গে সেই সমুদ্রে বিকেলে বেড়াতে এলো। সে তার বাবার সঙ্গে বেড়াবার বড় একটা সুযোগ পেত না। কারণ তার বাবা জমিদার মানুষ। জমিদারীর নানা কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তার ওপর তাঁর প্রচণ্ড নেশা হচ্ছে শিকার

করা। তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়ান আর শিকার করেন। অনেক বাঘ আর হাতী তিনি মেরেছেন। তাঁর ঘরে বড় বড় সব হাতীর দাঁত আর বাঘ ছাল জমা হয়ে আছে। সেইজন্যে এলির যখন বেড়াতে ইচ্ছে হয়, তখন সে তার মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়।

টম যখন পাহাড়ে বসে, তখন একদিন মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সাগরে বেড়াতে এলো। মাষ্টার এলিকে ঐ সমুদ্রের নানা জিনিষ দেখাচ্ছিলেন আর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এলি শুনছিলো আর নানা ধরণের প্রশ্ন করছিল। মাষ্টার মশাই তার জবাব ও দিচ্ছিলেন। শেষে এলি প্রশ্ন করলো: আচ্ছা! মাষ্টার মশাই! সব কথাই তো বললেন। কিন্তু জলপরীদের কথা তো কিছু বললেন না। মাষ্টার মশাই এলির কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন: জলপরী বলে কিছু নেই। লোকের ওসব ভুল ধারনা। তুমি কখনো ভুল জিনিষ বিশ্বাস করবে না আমি যা শেখাবো তাই শিখবে।

এলি বললো: কিন্তু আমি যে বইতে জলপরীদের ছবি দেখেছি।

মাষ্টার মশাই বললেন: য়া' দেখেছ সেটা অন্য জিনিষ। জলপরী নয়। কারণ জলপরী বলে কিছু নেই। আচ্ছা, আমি আগের দিন রাতে এখানে একটা বড় জাল পেতে রেখে গেছি। এখন সেটা টেনে তুলবো। যদি জলপরী বলে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই এই জালে উঠে আসবে।

টম অনেকক্ষণ জলপরীদের জন্যে পাহাড়ে বসে থেকে শেষে হতাশ হয়ে নেমে গিয়েছিল। সে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ঐ জালে গিয়ে আটকালো। এদিকে জালে টান পড়ছে। জাল ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে। টম জালটাকে যত ছাড়াতে যায় ততই আটকে যায়। ওদিকে এলির মাষ্টার ভাবলো কী ব্যাপার! জালে টান পড়ে কেন? কিছু একটা নড়াচড়া করছে বলেও মনে হচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে জালটাকে টেনে তুললেন। এবং তুলেই অবাক। এমন কাণ্ড তিনি জীবনেও আশা করেন নি।

এলি ছুটে এসে বললো: এই যে জলপরী! জলপরী! আমি বলেছিলাম যে জলপরী আছে। কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে নেই। এখন দেখলেন তো।

মাষ্টার মশাই রেগে গিয়ে বললেন ঃ এটা জলপরী তোমাকে কে বললো। এটাও এক ধরনের মাছ।

এলি কিছুতেই সে কথা মানবে না। সে বললো ঃ আপনি দেখছেন না। কেমন দুটো হাত, দুটো পা, আর চোখ রয়েছে। আর তা' ছাড়া গায়ে কোন আঁশও নেই! এটা জলপরী না হয়ে যায় না।

মাষ্টার বললেন ঃ ঠিক আছে। আমি লাঠি দিয়ে ভাল করে খুঁচিয়ে দেখছি। মাষ্টার লাঠি দিয়ে টমকে খোঁচাতে লাগলো। টম প্রথমটা একটু সহ্য করলো। তারপর রেগে গিয়ে মাষ্টার মশাইয়ের হাত কামড়ে দিল। মাষ্টার মশাই তাড়াতাড়ি হাতের লাঠিটা ফেলে দিতেই টম সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এলি দেখলো জলপরীটা পালিয়ে যাচ্ছে। সে ও সঙ্গে সঙ্গে টমকে ধরবার জন্যে ছুটতে লাগলো এবং শেষে জলে পড়ে অতলে তলিয়ে গেল।

মাষ্টার মশাই বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন একটা কাণ্ড যে তাঁর চোখের সামনে ঘটে যাবে তিনি ভাবতেও পারেন নি। তিনি বাড়ী গিয়ে কি জবাব দেবেন সেইটাই তাঁর ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

টম জলে নেমেই সাগরের গভীরে চলে গেল। তারপর সাঁতার কেটে পালাতে লাগলো। সে জানতেই পারলো না যে এলিও তার সঙ্গে জলে পড়ে গেছে। টম অনেকপথ সাঁতরে এসে এক জায়গায় দেখলো একটা খোঁচার মধ্যে একটা গল্‌দা চিংড়ি চুপচাপ বসে আছে। টম বললো ঃ কি ব্যাপার! তুমি এখানে?

গল্‌দা চিংড়ি বললো ঃ খাবারের লোভে এখানে ঢুকে পড়েছি। আর বেরুতে পারছি না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

টম বললো ঃ বেশ! আমি ভেতরে গিয়ে তোমাকে টেনে বার করে আনছি। টম খাঁচার ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চিংড়িটাকে বার করতে পারলো না। শেষে নিজেই ঐ খাঁচার মধ্যে আট্‌কে গেল। তা'হলে? এখন তো তোমার জন্যে আমিও বিপদে পড়লাম। এদিকে একটা বড় জলজন্তু ওদের দেখতে পেয়ে ভাবলো আরে বাপস্‌।

দু'দুটো একখানা জায়গায় রয়েছে। আর দেরী করা যায় না। সেই জলজন্তুটা সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার মধ্যে নেমে গেল। তখন সুরু হল তিনজনে সমানে যুদ্ধ। কে হারে। কে জেতে। চিংড়ি মাছটা ঐ জন্তুটার শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিতে লাগলো। টম তখন সুযোগ বুঝে ঐ জন্তুটার পিঠে উঠে খাঁচার বাইরে চলে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে পালালো। টম পালাতে পালাতে পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে খাঁচাটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। টম বুঝলো যে কোন জেলে ওদের নিশ্চয়ই ধরেছে। যাই হোক টম আর না দাঁড়িয়ে পালাতে লাগলো। পালাতে পালাতে তার মনে হল যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন সে জল থেকে উঠে সমুদ্রতটে বিশ্রাম করতে লাগলো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে সামনের পাহাড়ে একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখতে পেল। টম ভাবলো এটা জলপরী না হয়ে যায় না। সে তখনি সাঁতরে সেই পাহাড়ে এসে বললো : তুমি কি জলপরী ? এই জলে থাক ?

মেয়েটি বললো : হাঁা! আমি জলপরী! শুধু আমি নই। এই পাহাড়ে আমার মত অনেক জলপরী আছে। তারাও একটু পরে এসে পড়বে।

টম বললো : তোমাদের আমি কত খুঁজেছি। রাতের পর রাত জেগে থেকেছি তোমাদের দেখা পাবার জন্যে।

মেয়েটি বললো : কিন্তু আমরা তো অনেকদিন এখানে বাস করছি। তোমাকে তো আগে কোনদিন দেখিনি। যাই হোক আজকে যখন দেখা হয়ে গেল তখন চল আমরা কাজ সুরু করি।

টম অবাক হয়ে বললো : কি কাজ ?

মেয়েটি বললো : গতকাল ঝড়ে আমাদের বাগানখানা এলোমেলো হয়ে গেছে। ওটাকে ভাল করে সাজাতে হবে। আমাদের দিদিমণি দেখতে আসবেন।

টম বললো : বেশ ! তবে চলো !

ওরা বাগান সাজাতে লাগলো। যে সব গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে তাদের আবার নতুন করে বসিয়ে দিল। আরো নতুন নতুন সব বাহারী পাতার

গাছ লাগালো। পাহাড়টাকে নানা রঙ্গীন ঝিনুক দিয়ে সাজিয়ে দিল। তাদের দিদিমণি আসবেন। ওরা যখন পাহাড় সাজাচ্ছে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে জলপরী সেখানে এসে হাজির। তারা টমকে দেখে অবাক। টমও অবাক হল। টম ভাবলো এত জলপরী এতদিন কোথায় ছিল? অথচ সে এদের কত খুঁজেছে।

জলপরীরা টমকে দেখে নাচ-গান স্বরু করে দিল। টমও আনন্দে লাফাতে লাগলো। এমন সময় ওদের দিদিমণি এসে হাজির। কড়া-মেজাজী কাঠ-খোট্টা ধরনের চেহারা। ভারী বিশ্রী দেখতে। টমের দেখে একটুও ভাল লাগলো না। দিদিমণি আসতেই সব জলপরীরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। টম ও দাঁড়িয়ে গেল। দিদিমণি ওদের ভাল ভাল খাবার দিতে লাগলেন। কিন্তু টমকে দিলেন একরাশ বালি আর কাঁকর। টম খাবার দেখে অবাক। টম বললো: আমাকে এমন খাবার দিলেন কেন?

দিদিমণি বললেন: তুমি খুব দুষ্টু। সাগরের নীচে তুমি প্রত্যেকটি মাছ আর জীবজন্তুকে খুঁচিয়ে মেরেছ। কাউকে শান্তিতে থাকতে দাওনি। সেইজন্যে তোমার এই শাস্তি। যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। আমার কাছে উচিত বিচার। আমি এই দুনিয়াতে উচিত বিচার ফিরিয়ে আনতে চাই। সবাই কে বলতে চাই যে কাউকে কষ্ট দিলে বা মনে দুঃখ দিলে নিজেকেও শাস্তি পেতে হয়।

দিদিমণি কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে আকাশে মিলিয়ে গেলেন। সেই থেকে টম আর কাউকে কষ্ট দিত না। সবাইকে ভালবাসতে চেষ্টা করতো। সমস্ত জলপরীদের সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করতো। আর ভাবতো যে যদি আবার সেই দিদিমণি ফিরে আসেন তবে তাকেও ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দেবেন। ভালবেসে কোলে তুলে নেবেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। কয়েকদিন পরে আরেক দিদিমণি তাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। ভারী মিষ্টি চেহারা। চাঁদ পানা মুখ। দেখতে ভারী সুন্দর। তিনি আসতেই সব জলপরীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি প্রত্যেককে আদর করলেন। ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দিলেন।

তারপর টমকে বুকে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে তার হাতে সব চেয়ে ভাল মিষ্টি তুলে দিলেন। টম আনন্দে লাফাতে লাগলো আর বলতে লাগলো: আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি আর দুষ্টুমি করি না। কাউকে কোন কষ্ট দি' না।

দিদিমণি বললেন: সেই জন্যেই তোমাকে এই পুরস্কার দিলাম। আমি আশা করি তুমি এখন থেকে ভাল হয়েই থাকবে।

টম খুশি মনে ঘাড় নাড়লো।

কিন্তু দুষ্টুমি স্বভাবটা টম কিছুতেই ছাড়তে পারে না। জলের অতল তলে সে আজীবন দুষ্টুমি করে এসেছে। এখন হঠাৎ ছাড়ে কি করে। ভদ্র হবার সে বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে ওঠে না। তার এখন সব দুষ্টুমি গিয়ে জমা হয়েছে খাবারের দিকে। খাবার দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। সে খাবার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক। টমের মাঝে মাঝে মনে হয় যে সে অপরের খাবার চুরি করে খায়। কিন্তু দিদিমণির কথায় সাহস পায় না।

একদিন দিদিমণি এসে প্রত্যেকের হাতে খাবার দিলেন। টমও পেল প্রত্যেকে খাবার নিয়ে চলে গেল। ভাল ভাল সব খাবার। টমের আরো খেতে লোভ হল। সে ভাবলো, দিদিমণি এই খাবারগুলো কোথায় রাখেন দেখাই যাক। সে রাতের আঁধারে চুপি চুপি দিদিমণির পিছু পিছু গেল। গিয়ে দেখলো যে দিদিমণি ঐ খাবারগুলো এক পাহাড়ের গুহার নীচে লুকিয়ে রাখলেন।

ব্যাস্। আর যাবে কোথায়। সেই রাতেই টম লোভ সামলাতে না পেরে ঐ গুহায় ঢুকে ভাল ভাল সব খাবার খেয়ে ফেললো। কি মিষ্টি সব খাবার। টম পেট পুরে খেল। কিন্তু খাবার পরই ভাবনা হতে লাগলো। যদি কাল সে ধরা পড়ে যায় তবে কি ভয়ানক শাস্তি হবে। আসলে দিদি-মণি টমের কাণ্ড সবই দেখেছেন। কিন্তু কিছু বলেননি।

পরের দিন দিদিমণি এসে সবাইকে খাবার দিলেন। সবাই আনন্দে খেতে লাগলো। টমকেও দিলেন। কিন্তু টমের সে খাবার একটুও ভাল

লাগলো না। মনে হল অত্যন্ত তেতো। টম ভাবলো সবাই আনন্দে খাচ্ছে। অথচ সে খেতে পারছে না কেন? তবে কি দিদিমণি তার এই চুরি ধরে ফেলেছেন? এবং শাস্তি দিয়েছেন। টম চিন্তায় পড়ে গেল। এই ভাবে সাতদিন কাটলো। আরেক দিদিমণি এলেন। সবাই আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো। তিনি সবাইকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিলেন। কোলে নিয়ে আদর করলেন। হাত ধরে নানা লতা-পাতার ঘেরা বাগানে বেড়ালেন। টম সব দেখতে লাগলো। কিন্তু দিদিমণি তাকে কিছু বললেন না। তখন টম অধৈর্য্য হয়ে বললো: আমাকে খেতে দেবেন না।

দিদিমণি বললেন: তুমি খেতে পারবে না। এ সব খাবার তোমার মুখে তেতো লাগবে। আর এর জন্যে তুমি নিজেই দায়ী। দিদিমণির কথা শুনে টমের কান্না পাচ্ছিলো। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো: আমাকে একটু আদরও করবে না। দিদিমণি বললেন: তোমাকে কি করে আদর করি বলো? তোমাকে তো আমি কোলে নিতে পারবো না।

: কেন?

: তোমার সারা গায়ে ঘা হয়েছে। গন্ধ ছাড়ছে। এমন ঘা'ওলা ছেলেকে কি কেউ কোলে করতে পারে।

টম দিদিমণির কথা শুনে ওখানে বসে কাঁদতে লাগলো। কেউ তাকে আদরও করলো না। পরে সে কাঁদতে কাঁদতে দিদিমণিকে বললো: আমি চুরি করে খাবার খেয়েছিলাম। আমার অপরাধ হয়েছে। আমি এ কাজ আর কখনো করবো না।

দিদিমণি বললেন: বেশ! কাল থেকে আরেক নতুন দিদিমণিকে আমি পাঠাবো। তার কাছে তুমি নানা জিনিষ শিখবে। তবে তুমি ভাল হতে পারবে।

পরের দিন এক নতুন দিদিমণি এসে টমকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সত্যি কথা কি ভাবে বলতে হয়। কেন বলতে হয়। চুরি কেন করতে নেই। বা করলে কি ফল হয়। সবাইকে ভালবাসতে হয়। কেন বাসতে হয়। এই সব। টম মন দিয়ে সে সব শিখতে লাগলো।

টম যখন সত্যি ভাল ছেলে হয়ে গেল, তখন তার সারা গায়ের ঘা'ও শুকিয়ে গেল। তার চেহারা হয়ে গেল আরো সুন্দর। একেবারে চাঁদের মত ফুটফুটে। তা' দেখে নতুন দিদিমণি বললেন: আরে! তোমাকে ত' আমি চিনি। তুমি সেই টম না?

টম অবাক হয়ে সেই নতুন দিদিমণির দিকে চেয়ে বললো: তুমি কি এলি! জমিদারের মেয়ে? আমি যেখানে নোংরা পরিষ্কার করতে গিয়ে ছিলাম।

এলি বললো: হ্যাঁ! আমিই সেই এলি। তুমি হারিয়ে যেতে আমি সেদিন কত কেঁদেছিলাম। সেদিন আমার কান্না কেউ থামাতে পারে নি। আজ তোমাকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আজ আমি খুব খুশি।

এরপর টম আর এলিকে ছাড়তে চায় না। এলি যেখানে যায় টম সেখানে। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে সাগরের তলায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এখন টমের মনে আর কোন দুঃখ নেই। সে এলিকে পেয়েছে। সবাইকে ভালবাসতে শিখেছে। সেইজন্যে এখন সবাই টমকেও ভালবাসে। ভাল ভাল খাবারও খেতে দেয়।

কিন্তু কিছুদিন হল একটা চিন্তা টমের মাথায় ঢুকেছে। সেটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। কিছুদিন থেকে টমের মনে হচ্ছে এলি হঠাৎ যেন কোথায় চলে যায়। কাউকে কিছু না বলে। আবার কিছুদিন পরে হঠাৎ-ই ফিরে আসে।

টম কিছুদিন এলির এই চলাফেরাটা মন দিয়ে দেখলো। তারপর একদিন বললো: তুমি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যাও বলো তো।

এলি বললো: আমি এমন জায়গায় যাই যেখানে চট্ করে কেউ যেতে পারে না। যে সব ছেলেরা শুধু খেলে বেড়ায় বা ঘুরে বেড়ায় তাদের সেখানে যাওয়া মানা আছে। যারা অনেক লেখাপড়া করে। মানুষ হবার চেষ্টা করে। নানা দেশ ঘুরে জ্ঞান লাভ করে বা নানা দেশ সম্বন্ধে জানতে পারে, তারাই সেখানে যেতে পারে। তুমি যদি সেখানে যেতে চাও তবে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে।

টম বললো : কি কষ্ট।

এলি বললো : এই ভাবে ঘুরে বেড়ালে বা খেলে বেড়ালে চলবে না। তোমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কষ্ট করে নানা দেশ ঘুরে নানা দেশের কথা জানতে হবে। তবেই তুমি সেখানে যেতে পারবে।

টম বললো : তুমি কি কষ্ট করে সেই সব দেশে বেড়াতে গেছে ?

এলি বললো : হ্যাঁ! গেছি! সেইজন্যেই আমি সেখানে যেতে পারি। আচ্ছা! তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে একটা জিনিষ দেখাবো।

টম বললো : বেশ। চলো!

এলি তখন টমকে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিয়ে এসে একটা ছবির বই বার করলো। তারপর বললো : এই দেখো, এখানকার মানুষেরা কোন লেখাপড়া শেখে নি। কোন বই পড়েনি। কোন দেশ দেখেনি। সেই কারণে এরা কিছুই জানে না। এরা ঘর বাঁধতে জানে না। এরা চাষ করতে জানে না। ফসল ফলাতে জানে না। বন্যজন্তুকে কিভাবে ঠেকাতে হয় সে শিক্ষাও তাদের নেই। এবং তার ফল কি হয়েছে দেখেছ ?

: কি হয়েছে ?

: ফলে এরা আর কেউ বেঁচে নেই। এরা এখন সবাই মৃত।

: কেন ?

: কিছু মারা গেছে না খেতে পেয়ে। আর কিছু বন্যজন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলেছে। কারণ এরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার কোন শিক্ষা পায়নি। এবারে এই ছবিগুলো দেখো। এরা খুশির দেশের লোক। এ দেশের লোকেরা সবাই খুশি। এরা সবাই শিক্ষিত। সবাই লেখাপড়া জানে। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে নানা জিনিষ জেনে নিয়েছে। সেইজন্যে এরা ঘর বাঁধতে পারে। জমি চাষ করতে পারে। জন্তু-জানোয়ারেরা মারতে এলে ওরা অস্ত্র দিয়ে তাদের মেরে ফেলতে পারে। ফলে এরা সবাই খুশি। এবং এরা কেউ মরে যায়নি। সকলেই বেঁচে আছে। এখন বলো যে কোন দলে তুমি যেতে চাও। তুমি কি মাছ বা কোন জীব-জন্তু

হয়েই এই পৃথিবীতে থাকতে চাও। না, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে চাও।

টম বললো : আমি মানুষের মত মানুষ হয়েই এই পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। এলি বললো : তাহলে আর দেরী কোরো না। অচেনা পৃথিবীকে জানতে, অচেনা দেশকে জানতে, এখুনি বেরিয়ে পড়ো। এই পৃথিবীটা ভাল করে ঘুরে দেখো কি আছে। এর শেষ কোথায়। তবে তার আগে তোমাকে গ্রীমসকে খুঁজে বার করতে হবে।

টম বললো : তাই হবে। তোমার কথাই রাখবো। কিন্তু তুমি কথা দাও যে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। আবার আমি তোমাকে দেখতে পাব।

এলি বললো : পাবে। সময় মত তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমি তোমাকে ডেকে নেব। তবে শোনো, যাব বললেই যাওয়া যায় না। যাবার পথে অনেক বাধা আছে। এখান থেকে যাত্রা সুরু করে আগে তোমাকে ঝিলিমিলি রাজবাড়ী যেতে হবে।

টম বললো : সেটা আবার কোন পথে ?

: পথ তোমাকেই বার করে নিতে হবে। সে রাজবাড়ীতে একটা সিংহ দ্বার দেখতে পাবে। তার দরজা কখনো খোলে না। তোমাকে অনেক চেষ্টা করে খুলতে হবে। তারপর সেই সিংহদ্বারের পথ দিয়ে যেতে হবে অমৃত সরোবরে। সেখানে তোমাকে ভাল করে স্নান করতে হবে। পরে যেতে হবে হিমানী পর্ব্বতে। সেখানে বরফের রাণী বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তোমাকে আসল পথ বলে দেবেন। এবং তুমি জানবে যে সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের জ্ঞানের পথ। জীবনের চলার পথ।

টম হাঁপ ছেড়ে বললো : বাব্বা! এত পরিশ্রম ?

এলি বললো : হ্যাঁ! কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। পরিশ্রম না করলে জ্ঞান লাভ হয় না। জীবনে কিছুই জানা যায় না। তোমাকে কিছু জানতে গেলে, শিখতে গেলে, কষ্ট করতেই হবে।

টম বললো ঃ আমি তা'হলে চলতে সুরু করি। আশা করি তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।

টম চলতে সুরু করলো। সে চলেছে তো চলেছে। কোথাও থামছে না। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে। তবু তার চলার শেষ নেই। তাকে ঝিলিমিলি রাজবাড়ীতে পৌঁছুতেই হবে। সে চলতে চলতে সাগরের যত জীব-জন্তু আছে তাদের প্রশ্ন করলো ঃ তোমরা কেউ ঝিলিমিলি রাজবাড়ী চেনো।

ওরা সবাই বললো ঃ না।

টম আকাশের পাখীদের প্রশ্ন করলো। তারা বললো ঃ না। আমরা জানি না। কিন্তু টমকে হতাশ হলে চলবে না। সে মাছদের বললো ঃ তোমরা কি কিছু বলতে পারো ?

মাছের রাজা বললো ঃ জানি না বাপু। অমন নাম আমরা জীবনে শুনিনি। টম আবার চলতে সুরু করলো। চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলো পাখীর মেলা বসেছে। সাগর দেশের পাখীরা এক জায়গায় বসে সভা করছে। টম সেই সভায় গিয়ে বললো ঃ আমাকে তোমরা ঝিলিমিলি রাজবাড়ীর পথটা বলে দেবে ?

পাখীর রাজা বললো ঃ আমাদের সভা ভাংলে তুমি আমার পিঠে উঠে পড়বে। আমি তোমাকে যাবার পথে নামিয়ে দেব।

যাক ! এতক্ষণে তা'হলে পথের নিশানাটা পাওয়া গেল।

টম সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলো। শেষে ওদের সভা শেষ হলে সে পাখীর রাজার পিঠে চড়ে বসলো। পাখীর রাজা তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। এবং বহু দেশ পার করে শেষে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললো ঃ আমি এবারে বাঁ দিকে চলে যাব। তুমি ডানদিকের পথ ধরে সোজা চলে যাও। টম ডান দিকের পথ ধরে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু সেটা বন্ধ। এখন টম ভেতরে ঢুকবে কি করে ? নানা লোককে প্রশ্ন করলো। কেউ বলতে পারলো না। শেষে টম এক লম্বা ডুব দিয়ে সিংহদ্বারের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর সেই পথ

দিয়ে সোজা চলে এল অমৃত সরোবরে। সেখানে ডুবের পর ডুব দিতে লাগলো। এবং শেষে ডুব দিতে দিতে ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গেল। টম তলিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তলিয়ে যেতে যেতে এক সময় টম এক আলোর রাজ্য দেখতে পেল। এত আলো টম জীবনে দেখেনি। টম অবাক হয়ে দেখলো সামনে একটা প্রকাণ্ড বরফের পাহাড়। যাকে বলে হিমানী পর্ব্বত। টমের এলির কথা মনে পড়ল। এলি এমন একটা কথা বলেছিল বটে। তা'হলে সে এবারে হিমানী পর্ব্বতে এসে পেঁাচেছে। টম সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো। সামনে পড়ল এক বিরাট সরোবর। তা'তে নানা রঙের পদ্ম ফুটে আছে। রঙীন মাছেরা গা' এলিয়ে শুয়ে আছে। টম বললো ঃ তোমাদের রাণী কোথায় ?

মাছেরা বললো ঃ ঐ'তো সামনে পদ্ম পাতায় রাজসিংহাসনে বসে আছে। টম তাকিয়ে দেখলো একটা বিরাট নারী মূর্তি শাদা বরফের শাড়ীতে নিজেকে মুড়ে বসে আছে। টমকে দেখে তিনি বললেন ঃ তুমি এখানে কি চাও।

টম বললো ঃ আমি পৃথিবীর ওপারে যেতে চাই।

রাণী বললেন ঃ তুমি প্রায় পৃথিবী ছাড়িয়ে এসেছো। এখানে এসে পেঁাছুতে তোমার যা' কষ্ট হয়েছে, তা'তে তুমি কিছু জ্ঞান লাভ করেছ। এবারে তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও। তা'হলে তুমি তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব ঘটনা জানতে পারবে। তুমি চেতনা লাভ করবে।

টম সে কথা শুনে সোজাসুজি মহারাণীর চোখে চোখ রাখলো। শেষে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো ঃ আমি তো' আর পথ দেখতে পাচ্ছি না। আমার কেমন যেন সব ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথা ঘুরছে।

মহারাণী বললেন ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার নিজের চলার পথ তুমি নিজেই খুঁজে পাবে। এবং চলতে চলতেই পাবে। তুমি এখন আবার চলা সুরু কর। তবে একটা কথা। পথ চলবে সামনে। কিন্তু নজর

রাখবে পেছনে। অর্থাৎ এখন থেকে তুমি আরো বেশী সাবধানী হবে। সাবধানী না হলে বিপদে পড়তে পার। পেছনে নজর রেখে সামনে চলবে।

টম বললোঃ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি আপনার কথা মতই চলবো।

টম আবার চলতে সুরু করলো। চলতে চলতে সে বহু পাহাড় আর দ্বীপ পার হল। তারপর সাগরের নীচে শাদা বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। সেখানে সে দেখলো সামনে সাগরের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। হাজার হাজার জন্তু জানোয়ারেরা মরে পড়ে আছে। টম অতি কষ্টে তাদের ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে হোঁচোট্‌ খেতে খেতে পার হয়ে এলো। পরে সামনে পড়লো একটা অতিকায় সামুদ্রিক মাছ। টম তাকে ডিঙ্গিয়ে আসতে পারলো না। তখন সে বাধ্য হয়ে অনেক ঘুর পথে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একটা গুহার সামনে এল। গুহা থেকে স্রোতের জল ছুটে আসছে। আর আসছে আলো। সূর্য্যের মত আলো। টম অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। এমন সময় এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেখানকার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। টম সঙ্গে সঙ্গে উলটিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। শেষে বুঝতে পারলো যে, সে একটা বিরাট জন্তুর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

জন্তুটা রেগে গিয়ে বললোঃ তুই ব্যাটা কেরে? আমার পিঠে দাঁড়িয়ে আছিস্‌? তোর সাহস তো কম নয়। এখানে চুপি চুপি সোনা চুরি করতে এসেছিস্‌। দাঁড়া, আমি সব আমার গুহায় লুকিয়ে ফেলছি। এই বলে ঐ জন্তুটা তার ল্যাজটা জোরে নাড়া দিতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কাতারে কাতারে সোনা, রূপো, দস্তা, তামা, ইত্যাদি নানা জিনিষ সেই গুহার মধ্যে ঝরে পড়তে লাগলো। তারপর ঐ জন্তুটাও ঐ গুহায় ঢুকে পড়লো। টম ভাবলো দেখতে হবে ঐ গুহায় কি আছে। সেও সাহস করে ঢুকলো। সেই গুহার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সে এক অদ্ভুত দেশে এসে দাঁড়ালো। সেখানে সব ব্যাপারটাই উলটো। বানরেরা জমি চাষ করছে। সিংহরা

ছেলেদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খরগোশের কোলে ছোট ছোট মেয়েরা শুয়ে আছে। গাধারা দোকানে বসে জিনিষ বেচছে।

টম অবাক হয়ে চলতে চলতে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন পাহারাদার এসে বললো : তুমি কে? কোথা থেকে আসছো?

টম বললো : আমি বরফের রাণীর কাছ থেকে আসছি। আমি আমার মনিব গ্রীমস্‌কে খোঁজ করছি। তা'কে না পেলে আমার কিছুই হবে না।

পাহারাদার একটু চিন্তা করে বললো : ও ব্যাটা এখানকার আসামী! জেলে বন্দী আছে।

টম বললো : তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল। পাহারাদার টমকে জেলের সামনে নিয়ে এল। টম দেখলো গ্রীমস্‌ এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে বসে আপন মনেই গালি গালাজ করছে আর দেওয়ালে লাথি মারছে। সে টমকে দেখে বললো : তুমি ব্যাটা আবার এখানে কেন? আমাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে মেরেছিস্‌। আবার এখানেও জ্বালাতে এসেছিস?

টম বললো : আমি তোমাকে জ্বালাতে আসিনি। তোমাকে জেল থেকে বার করতে এসেছি।

গ্রীমস্‌ সে কথা শুনে রেগে গিয়ে বললো : আর সোহাগ জানাতে হবে না। যা! যা! দূর হয়ে যা। আমার সামনে থেকে। এখনই শিলাবৃষ্টি হবে। আমার পিঠে এসে শিলা পড়তে থাকবে। আমি যন্ত্রণায় কষ্ট পাব।

টম বললো : তা' একটু কষ্ট তোমাকে পেতেই হবে। ও বৃষ্টি শিলা বৃষ্টি নয়। ও তোমার মায়ের চোখের জল। তুমি তোমার মা'কে অনেক কষ্ট দিয়েছিলে বলে তোমার মা আজো কাঁদছেন।

: তুই কি করে জানলি?

: আমি অনেক কষ্ট করে এ কথা জেনেছি এবং তোমাকে জানাতে এতপথ ছুটে আসছি।

গ্রীমস্ তখন ভাবলো ছেলেটা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। মাকে তার মনেই পড়ে না। খুব ছোট বেলায় তার মা মারা গেছে। সে কোনদিন তার মায়ের কথা চিন্তাও করে নি। এবং কোন খোঁজও করে নি। মায়ের কথা চিন্তা করতে করতে গ্রীমসের চোখে জল এল। তখন সে ভাবলো এই ছেলেটা কত দূর দেশ থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছে। গ্রীমস্ শেষে ভাবলো সে টমের ওপরও ভাল ব্যবহার করে নি। তাকে যখন খুশী মেরেছে। অকথ্য গালিগালাজ করেছে। ভাল করে দু'বেলা খেতে পর্যান্ত দেয় নি। আর আজ সে নিজে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে। তাকে এই জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে। ভাবতে ভাবতে গ্রীমস্ হাঁউ-মাউ করে কাঁদতে লাগলো। সেই দেখে টমও কান্না সুরু করলো। যখন দু'জন দু'জনের গলাজড়িয়ে ধরে কাঁদছে, তখন সেখানে হঠাৎ টমের দিদিমণি এসে হাজির। সে এসে বললো : আমাকে চিনতে পারছো? এখন দেখো কান্নার জন্যে গ্রীমস্ এর গায়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনেও আর কোন ময়লা নেই। আজ সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। দুঃখ পেয়ে পেয়ে মানুষ খাঁটি সোনা হয়। আজ সে খাঁটি সোনা তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে আজ আর কোন খাদ নেই। সেইজন্যে সে আজ জেল থেকে ছাড়া পেল। সে এখন মুক্ত। আমি তাকে মুক্তি দিলাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেখানে এলি এসে বললো : দেখো আমিও তোমাদের মধ্যে এসে গেছি। আজ আমরা সবাই সমান। আজ আমাদের মধ্যে কোন বড়-ছোটোর ভেদ নেই। আমরা সবাই আজ এক এবং একাকার।

এমন সময় সেখানে বরফের রাণীও এসে দাঁড়ালেন। সবাই অবাক। এমন একটা ঘটনার জন্যে কেউ তৈরী ছিল না। বরফের রাণী সামনে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকাতে লাগলেন। আর সকলে দেখতে লাগলেন যে পলকে পলকে রাণীর রং পালটাচ্ছে। কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো সবুজ। হরেক রকম বাহারী রং-এ নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি

এলিকে বললেন : আজ থেকে এরা সবাই মুক্ত। এখন থেকে এরা যেমন খুশী চলতে পারবে। যেখানে খুশী যেতে পারবে। যা' খুশী করতে পারবে। এদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আর কষ্ট আজ থেকে সার্থক। তুমি ওদের যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পার। আজ ওরা পরিশ্রমের মূল্য এবং পুরষ্কার পেয়েছে। ওরা এখন খুশীর দেশের লোক। খুশীর দেশেই ওরা বাস করবে।

তখন সকলে হাত জোড় করে মহারাণীকে নমস্কার জানালো। মহারাণী কথা বলতে বলতে আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

এলি, টম আর গ্রীমস্ হাত ধরে একই পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। আজকে ওদের জীবনে আর কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই। কোন বাধা নেই। আজ ওরা বিভেদের বেড়া ভেঙ্গে পরস্পরের কাছে একান্ত আপন হয়ে উঠেছে। ওরা এখন খুশীর দেশের লোক। এখানে সবাই সমান। এখানে গরীব বা বড় লোক বলে কিছু নেই। সত্য, নিষ্ঠা, সাধনা এবং পরিশ্রমের ফলেই মানুষ এ দেশে পৌঁছাতে পারে। এবং আনন্দে বাস করতে পারে। এক কথায় এটা একটি আনন্দমেলা। আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে অনেক পরিশ্রমে এবং কষ্টে একে পেতে হয়। যেমন এলি এবং টম আজ পেল। এলি উঁচু শ্রেণীর মেয়ে। কিন্তু গ্রীমস্ এবং টম নীচু শ্রেণীর বাসিন্দা। স্বপ্নজীবনে সাগরতলে এবং এই আনন্দলোকে এরা সবাই একান্তই আপনজন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু।
